স্বপ্ন নগরী নিউইয়র্ক

এম বাহাউদ্দিন

email: probashi_writer@yahoo.ca

এম. বাহাউদ্দিনের উপন্যাস 'স্বপ্ন নগরী নিউইয়র্ক' ধারাবাহিক ভাবে আমরা প্রকাশ করছি প্রতি রবিবার। ১০ টি পর্বে প্রকাশিতব্য এই উপন্যাসটির পর্ব-৬ আজ রবিবার, এপ্রিল ১০, ২০০৫ এ প্রকাশিত হলো। আপনার মতামত লেখককে জানান এই ঠিকানায়ঃ probashi_writer@yahoo.ca –সম্পাদক

৬ষ্ঠ পর্ব

পূর্ব প্রকাশিতের পর...

-৪১-

আনিসের মেসের হানিফের কাগজের ব্যবস্থা হয়েছে এবং তার পরিবারও এসে গেছে।

নিউইয়র্কে দুজন বাঙালী উকিল আছে। তাদের অফিস ম্যাহাটনে। আমেরিকান উকিলের ষ্টাইলে কাজ চলে। তারা প্রধানত প্রবাসী বাঙালীর সেবা করে। তারা করতে পারে না এমন কোন কাজ নেই। শেষ পর্যন্ত কতটুকু সফল হবে তা পরে দেখা যাবে। প্রথম আলাপে বলে দেয় সবই পারবে। টাকাটা হাতে আসুক। মাছ বরশিতে আটকে গেলে খেলা যাবে। অনেক দিন, অনেক ভাবে। তারিখ দিতে থাকে। তারিখের পর তারিখ দিতে না পারলে তারা যে উকিল তার প্রমান কি? সব দেশে সব জাতের উকিলের একই স্বভাব। অন্যের পকেটের টাকা নিজের পকেটে আনাই তাদের পেশা।

সেই একজন উকিল হানিফের বড় উপকার করেছে। যদিও সামান্য পয়সা নিয়েছে। কিন্তু বুদ্ধিটা খুব কাজে লেগেছে। কাগজের জন্য আর চিন্তা করতে হবেনা। এখানে কন্ট্রাক্ট মেরেজও করতে হবেনা।

বাংলাদেশে ওপি ওয়ানের খেলা চলছে। ব্যবসা চলছে। খুব লাভজনক ব্যবসা। যারা লটারি পেয়েছে তারা কেউ নিজের কাজে লাগাচ্ছে, অন্যের কাজেও সাহায্য করছে। কেউ পেয়েও কিছু পায়নি, তাদের হাতে পৌছেনি। কেউ হাতে পেয়েও নিজের জন্য ব্যবহার করেনি। কেউ নিজেও ব্যবহার করছে আবার সাথে সাথে ব্যবসাও করছে। এমন একটা ওপি ওয়ানের সন্ধান মিলেছে যে নাকি তিনটা বাচ্চা সহ লটারি পেয়েছে। ভদ্রলোকের নাম ওসমান আলী। কাজ করতেন সি

এন্ড বিতে। ইঞ্জিনিয়ার। ঘুষ খাওয়ার অপরাধে চাকরি গেছে। যা বাংলাদেশে সচরাচর হয়না। অন্য কারন থাকতে পারে। হয়ত ভাগাভাগি ঠিক হয়নি। চাকরি গেছে তাতে ওসমানের কোন চিন্তা নেই। যথেষ্ট টাকা আছে। কাজ না করলেও আরামে চলে যাবে জীবন। খেলাচ্ছলে তিনি লটারির জন্য দরখাস্ত করেছিলেন। দেখা যাক কি হয়। তাই হয়ে গেল। যার প্রয়োজন নেই তার ভাগেই মিলে গেল লটারি। তিনি পরিবার নিয়ে আসবেন না। শুধু নিজে এসে দেখে যাবেন। যদি সব কিছু অনুকূল মনে হয় তাহলে পরে দেখা যাবে। সেভাবেই প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

হানিফের ভাই যোগাযোগ করল ওসমানের সাথে। প্রস্তাব দিল হানিফের পরিবারকে ওসমানের পরিবার দেখিয়ে নিয়ে আসার জন্য। তার জন্য তিনি যা চান তাই দেয়া হবে।

ওসমান অবশ্য বাজার দর জানে। লটারি পাবার পর তার কাছে অনেক রকম প্রস্তাব এসেছে। কেউ বলেছে বিক্রি করে দেন। দশ লাখ পাবেন। কেউ বলেছে আমার একটা ছেলে নিয়ে যান দু লাখ পাবেন। কেউ বলেছে আমার মেয়েটা নিয়ে যান স্ত্রী হিসাবে ইত্যাদি অনেক প্রস্তাব আছে। হানিফের ভাই প্রস্তাব দিলে ওসমান দাবী করল দশ লাখ।

শুনে হানিফ বলল রাজি। তবে আট লাখ বাংলাদেশে দিব আর দু লাখ এখানে আসার পর। কারন এখানে তো তার টাকার দরকার হবে। হানিফ অতিষ্ট হয়ে গেছে। পরিবার ছাড়া চার বছর! বউ ছেলেমেয়ে ছাড়া জীবন দিয়ে কি হবে! টাকা দিয়েই বা কি হবে! খাটলে টাকা রোজগার করা যাবে। সুযোগ পাওয়া যাবেনা। অতএব টাকার প্রশ্ন বড় প্রশ্ন নয়। তাই সে ধার কর্জ করে দশ লাখ টাকা পাঠিয়ে দিল। দু মাসের মধ্যেই তার পরিবার ওসমানের পরিবার হিসাবে এসে পৌছল।

পরিবার পৌঁছার এক মাস আগেই হানিফ দু বেডরুমের একটা বাসা নিয়েছে। যেদিন বাসায় চলে যায় সেদিন মেসে ছোটখাটো একটা আয়োজন হয়েছে। বিদায়ের আয়োজন। আনিসই এই ব্যবস্থা করেছে। হানিফের চেহারাই বদলে গেছে খুশিতে। মেসের জীবনটা হানিফের কাছে একটা শাস্তি। পালা করে কাজ করা। যেসব কাজগুলো শুধু মেয়েদের জন্য বরাদ্দ করা আছে আমাদের দেশে সে সব কাজ যে যে-কোন মানুষ করতে পারে বা করতে হয় তা হানিফ হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। তারপরও সেসব কাজে আজীবন অভ্যস্থ হয়ে গেছে তা তার কাছে অস্বাভাবিক মনে হয়। মেয়েদের কাজ মেয়েদেরই সাজে। যদিও সে বুঝে গেছে মেয়েদের বলতে আলাদা এমন কোন কাজ নেই। কাজ সকলের জন্যই সমান। প্রয়োজনে সব কাজই করতে হয়। তাই সে আনন্দে আত্মহারা। অন্তত রান্নাঘরে আর যেতে হবেনা। এত অল্প সময়ের ভিতর তার পরিবার আনার ব্যবস্থা হয়ে যাবে তা সে ভাবতেও পারেনি।

সেই বিদায়ের পার্টিতে হানিফ বলল, আমার সিটটা তো খালি হল। ওসমান সাহেব আসলে সে এই সিটে থাকলে তোমাদের কোন অসুবিধে হবে কি?

সকলেই বলল, তাহলে তো আরও ভাল হল।

পরিবার এসে পৌছলে সবাইকে নিয়ে একটা পার্টি দিয়ে দিল বিরাট করে। তার কিছুদিনের মধ্যেই স্ত্রী পুত্র কন্যা গ্রীন কার্ড পেয়ে গেল। আহ্ শান্তি। তারপর নিজের স্ত্রীকে বিয়ে করবে, গ্রীন কার্ডের জন্য দরখাস্ত করবে। অবশ্য অনেক দিন লাগবে। লাগুক। এখন আর চিন্তা নাই। সবাই এসে গেছে তার কাছে।

পার্টিতে অনেক বন্ধুবান্ধব। সকলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল তার স্ত্রীকে।

ওসমানের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। স্থুল দেহ। কাঁচা পাকা চুল। মেসে থাকার কোন অভিজ্ঞতা নেই। রান্না দূরে থাক, তিনি নিজের বাসনখানাও পরিস্কার করতে অভ্যস্থ নন। ননীর পুতুল। মেসের আর সকলে প্রথম প্রথম একটু সহানুভুতি দেখিয়েছে। পরে উপদেশ, তারপর রুটিন ইত্যাদি। ওসমান পরের টাকা দিয়ে নিজের আরামের জীবন কাটাতে অভ্যস্থ। নিজের পকেটের টাকা খরচ করতে রাজি নন। এখানে পৌঁছেই বাকী দুলাখ টাকা দাবী করলেন হানিফের কাছে।

হানিফ বলল, এসেছেন তো এই মাত্র। একটু সময় লাগবে বাকি টাকাটা দিতে। এখন নিজের পকেট থেকে কিছু খরচ করুন।

ওসমান ভয় পেয়ে গেল। বোধ হয় বাকি টাকা দিবেনা। বলল, আমি তো কোন টাকা নিয়ে আসিনি।

বিদেশে এসেছেন টাকা নিয়ে আসেননি এটা আবার কেমন কথা হল? তাহলে কোন একটা কাজ দেখুন। এমনি করে ছয় মাস কেটে গেল। হানিফ আর ওসমানের মাঝে একটা নীরব তিক্ততা বাড়তে লাগল।

হঠাৎ করে হানিফের কাজ নেই। যে রেষ্টুরেন্টে কাজ করত তার মালিকের স্ত্রী খুন হয়েছে। নিজ বাড়ীতে, নিজের বেড রুমে। রেষ্টুরেন্ট মালিক আজরফ ছিল তখন রেষ্টুরেন্টে কাজে ব্যস্ত। বাড়ীতে একটা চাকর ছিল। যা এদেশে কল্পনা করা যায়না। কারন টাকা। ব্যবসা করে যে টাকা কামিয়েছে তা ব্যবহার করতে হবে তো! তাই দেশ থেকে স্পন্সর করে কাজের লোক এনেছে। বাসার রান্নাবান্না থেকে সব কাজ করে কাজের লোক রমজান। স্ত্রী মালেকা খুনের সময় বাসায় একমাত্র রমজানই ছিল রান্নার কাজে ব্যস্ত। খুনের ঘটনায় যা হয় তাই হল। সন্দেহজনক পাঁচ জনকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেল। আজরফ সহ। এ পর্যন্তই বাংলা খবরের কাগজগুলোতে খবর প্রকাশ হয়েছে। রেষ্টুরেন্ট অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ।

রেস্টুরেন্ট বন্ধের সাথে হানিফ বেকার হয়ে গেল। কাজে কাজেই হানিফ এখন বাকী টাকা দিতে পারছেনা। তাছাড়া যাদের কাছ থেকে ধার করেছিল তাদের টাকাও দিতে পারছেনা। ওসমান এসব যুক্তি শুনতে রাজি নয়। কাজ হয়ে গেছে টাকা চাই। কথায় কথা বাড়তে লাগল। এ কান থেকে ও কানে। মেসের সবাই জেনে গেল। হানিফ টাকা মেরে দিয়েছে। কথামত টাকা দিচ্ছেনা। কেউ বলছে তার এখন অসুবিধা। ফেমিলি এসেছে, নিজের কাজ নেই, অথচ খরচ বন্ধ থাকবেনা। অনেক কথা।

সেদিন মেসের সকলের সাথে কথা হচ্ছিল। সব শুনে আনিস বলল, ওসমান ভাই, হানিফ ভাইকে একটু সময় দেন। তার একটা কাজ হোক। তারপর তাকে চাপ দিন। এখন বেচারা নিজেই অসুবিধায় আছে। খবরের কাগজে দেখুন না। রেষ্টুরেন্ট বন্ধ।

কোন কাজ হয়নি। তিনি আবার হানিফকে চাপ দিতে থাকলেন। বললেন, এখানে উকিলের সাথে কথা হয়েছে। তিনি যদি হানিফের স্ত্রীকে তালাক না দেন তাহলে হানিফ তার স্ত্রীকে নিজের কাছে রাখার অধিকার নেই। আরও যে কত রকমের আইনের ফাঁক ফোকর আছে তা তিনি জেনে নেননি। অথবা টাকার চিন্তায় তার মগজ কাজ করেনি। এখানে স্ত্রীর কতটুকু ক্ষমতা আছে, আর কতটুকু প্রয়োগ করতে পারে তিনি অনুমান করতে পারেননি। সতের বছর দাম্পত্য জীবন কাটানোর পর, চার সন্তানের জনক জননী হবার পর স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে ধর্ষনের মামলা

করেছে। সে মামলায় স্বামীর সাজা হয়েছে পাঁচ বছর। এই নারী স্বাধীনতার দেশে, নারী স্বাধীনতা, নারী অধিকার কতটুকু আছে, আর কতটুকু ব্যবহার করতে পারে তা ওসমান সাহেব খেয়াল করেননি। একদিন তর্কাতর্কির পর হানিফ বলে দিল, যান, টাকা পাবেন না। যা পারেন করেন গিয়ে।

তারপর হানিফ এমন বেশি কিছু করেনি। তার স্ত্রীকে বলল অফিসিয়েলি ওসমানকে তালাকনামা পাঠিয়ে দাও। অবশ্য উকিলের সাহায্যে। ওসমান সই করতে বাধ্য হল। এখন আর ওসমান সে মহিলাকে স্ত্রী বলে দাবী করতে পারেনা। এদিকে টাকার জ্বলুনি। দু লাখ টাকা! ছেড়ে দেয়া যায়না। যার তার সাথে বসে বসে বুদ্ধি চায়, যখন তখন সালিশ বসাতে চায়। কারন এ টাকা দাবী করার কোন প্রমান দেখাতে পারেনা। একমাত্র নিজেরাই সমাধা করতে পারে। এক সময় এই কানাঘুষা বহুদূর ছড়িয়ে পড়ল।

হানিফ শেষ পর্যন্ত তার স্ত্রীকে দিয়ে একটা মামলা ঠুকে দিল। সন্তানের ভরনপোষন দাবী করে। এদেশে নিয়ম হল, স্বামী স্ত্রীর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলে স্ত্রী হয়ে যায় সিংগল মাদার। ছেলে মেয়ে ভরনপোষনের দায়িত্ব নিতে হয় পিতাকে। যতদিন পর্যন্ত সন্তান আঠার বছরে পা না দিবে ততদিন পিতাকে ছেলেমেয়েদের ভরনপোষন দিতে বাধ্য থাকবে।

মামলা আদলতে। রায় হল সোজা। ওসমান তার এক্স-ওয়াইফকে কিছু না দিলেও চলবে। কিন্তু বাচ্ছাদের জন্য মাসোহারা দিতে হবে। প্রতি মাসে ২০০ ডলার, তিন বাচ্ছার জন্য ছয় শ ডলার। আঠার বছর বয়স পর্যন্ত। চলতি মাস থেকেই দিতে হবে।

রায় শুনে ওসমান অচেতন অবস্থায় বাসায় ফিরে বিছানায় পড়ে গেল। কারও সাথে কথা বলেনি দুদিন।

তার এক মাস পর রেষ্টুরেন্ট খুলল। আজরফ বেলে ছাড়া পেয়েছে। আবার ব্যবসা শুরু হয়েছে। সককিছু আগের মত চলছে। মালেকা নেই বলে পৃথিবীর কিছু যায় আসে না। একজন স্ত্রী না থাকলে কোন কাজ থেমে থাকতে পারেনা।

হানিফ কাজে ফিরে এসে অনেকটা শান্তিতে আছে। ভাল বেতন পায়। তাছাড়া আর একটা আয় শুরু হয়েছে। ওসমানের টাকা। তার স্ত্রীর নামে আসে প্রতি মাসে একটা চেক। হানিফ হিসাব করেছে। আট লাখ টাকায় কত ডলার দিয়েছে। এই ছয় শত হিসেবে কত বছরে এই টাকাটা ফেরত আসবে তার একটা হিসাব করেছে। যখন তার এই দশ লাখ পরিমান ডলার তার স্ত্রীর হাতে পৌছবে তার পর থেকে এটা বন্ধ করে দিবে। এই টাকা নেয়াটা তার হক বলে মনে করছে। তার নিজের টাকাই সে ফেরত নিচ্ছে এই ভেবে মনে মনে শান্তি পায়।

মানুষের জীবনে কতভাবে শান্তি আসে কে জানে!

-৪২-

মাসের শেষ রবিবারেই আসর বসে। আনিস সকাল দশটায় গিয়ে পৌছল বাহারের বাসায়। গিয়ে দেখে বাহার রান্নাঘরে তরকারি কাটাকাটি করছে। বিন্দু বাচ্চাদের খাবার তদারকি করছে। বাহার বলল, এস, আমার সাথে কাজে লেগে যাও। পনের বিশ জন লোকের খাবার প্রস্তুত করতে হবে। আইটেম হবে তিনটা। ইলিশ মাছ, ডাল আর

সবজি। এই আসরের দিন ঘর থেকে সহযোগিতা বেশি পাওয়া যায়না। তবে আমি সব প্রস্তুত করে দিলে রান্নাটা করে দেয়।

প্রায় প্রতিটি আসরে লতা উপস্থিত থাকতে চেষ্টা করে। আনিস এদিক ওদিক তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, লতা ভাবী আসেনি।

বিন্দু বলল, না, লতা আজ আসতে পারবে না। তার বাসায় আজ ইসলামি জলসা হবে।

শুনে আনিসের মন খারাপ হয়ে গেল। লতা না থাকলে তার কাছে মনে হয় আসর জমেনি, অনেকটা ফাঁকা মনে হয়।

বিন্দু বাহারকে বলল, তুমি তো তোমার সহযোগী পেয়ে গেছ। আজকে আমার ছুটি। এখন আমি টিভিতে বাংলা প্রোগ্রাম দেখব।

আনিস জিজ্ঞেস করল, এখানে কয়টা বাংলা টিভি আছে বাহার ভাই?

এখানে টিভি আছে, রেডিও আছে। সবাই চেষ্টা করে এ দেশটাকে মিনি বাংলাদেশ তৈরি করে দেশে ফেলে আসা অভাবটাকে ভুলে থাকতে। প্রবাসে সংবাদ মাধ্যম বাঙালীদের আশাতীত না হলেও কিছুটা সংবাদ আহরনের খোরাক যুগাতে সক্ষম হয়েছে। নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত কিছু সংবাদ মাধ্যম যারা কৃত্তিত্বের দাবীদার তারা এই দূর প্রবাসে স্থানীয় ভাবে এবং দেশের সাথে যোগাযোগের সেতু হিসেবে কাজ করেছে।

প্রথমেই ধরা যাক বাংলা বেতারের কথা। সালেহ আহাম্মদ পরিচালিত বাংলা বেতার 'সাতরং' এবং কৌশিক আহম্মদ পরিচালিত 'শ্যামলছায়া' কিছুদিন চলার পর বন্ধ হয়ে যায়। আশরাফুল ইসলাম পরিচালিত 'পদ্মার ঢেউ' দীর্ঘ দিন চলার পর একবারেই থেকে যায়। বাংলা টেলিভিশন 'বাংলার মুখ' বেশ কিছুদিন চলার পর বন্ধ হয়ে যায়। বিবিএন নামে একটি টিভি অনুষ্ঠান মাত্র একদিন প্রচার হয়েছিল। 'বর্তমানে তিনটি বেতার অনুষ্ঠান বাঙালীর খোরাক যোগাচ্ছে। বাংলার মুখ, বেতার জগত ও ভয়েস অব আমেরিকা বাংলা অনুষ্ঠান প্রচার করছে। ভয়েস অব আমেরিকা ১৯৫৮ সাল থেকে বাংলা প্রচারিত হয়ে আসছে। এর সূচনাতে যারা ছিলেন তারা হলেন: ইশ্‌তিয়াক আমেদ, সাঈদ সিদ্দিকী, নুরুল আরম রঞ্জন রবা, প্রসুন মিত্র, আব্দুল্লা আল ফারুক, কামনশিষ চক্রবর্তী, নাজমা চৌধুরী, সুমন চট্টোপাধ্যায় প্রমূখ।

যারা বাংলা অনুষ্ঠানের সাথে যুক্ত আছেন তারা হলেন: ইকবাল আহমেদ, ইকবাল বাহার চৌধুরী, কাফি খান, শরফুল আলম, সরকার কবিরুদ্দিন, রোকেয়া হায়দার, মাসুমা খাতুন, দিলারা হাশেম, রুমেন পাইন, দেবাংশু বন্দোপাধ্যায়, জিয়াউর রহমান, হিল্লোল সরকার, অসীম চক্রবর্তি ও শেগুফতা নাসরীন কুইন। নিউইয়র্ক প্রতিনিধি জাকিয়া খান।

বর্তমানে একমাত্র বাঙালীর টেলিভিশন রূপসী বাংলা আনিসুজ্জামান খোকনের পরিচালনায় দীর্ঘদিন থেকে নিয়মিত প্রচার হচ্ছে। এখন বিন্দু যে অনুষ্ঠান দেখবে তা হল রূপসী বাংলার অনুষ্ঠান।

ঠিক আছে, আজকে ভাবীর ছুটি। আনিস বলল। আমারও কিন্তু রান্নার হাতেখড়ি হয়ে গেছে। সব্জিটা আমি রান্না করব।

বাহার বলল, আমি মাছ রান্না করব ।

কই, কেউ আসেনি এখনও? বলে ঘরে ঢুকলেন একজন। হাতে একটা পেকেট। মাথার চুল একদম সাদা। শক্তসামর্থ দেহ। ষাটের উপর বয়স। বাহার তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল। বসুন আলমগীর ভাই! এই তো এসে পড়বে সকলে। আনিসের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। ইনি হলেন ডঃ খন্দকার আলমগীর। একজন ভাষা সৈনিক। এদেশে আছেন প্রায় চল্লিশ বছর। এখানে একটা হসপিটালে ডাক্তার। ভাইবোন সব

নিয়ে এসেছেন এই দেশে। নিঃসন্তান। স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে দুবছর আগে। এখন বেচেলর। ভাল প্রবন্ধ লেখেন। এর মধ্যে আরও দুজন এসে পৌছল। বাহার একজনের পরিচয় দিল। এই হল আমাদের কবি হাসান আল আব্দুল্লাহ। বেশ কয়েকটা কবিতার বই বেরিয়েছে। তার অনেক কবিতা অনেক জায়গায় ছাপা হয়। একটা স্কুলে অংক পড়ায়। নিজেও পড়ে।

ইনি হলেন আব্দুল মালেক। সকলেই মামা বলে ডাকে। ভারত স্বাধীনতার একজন বীর সেনানী। এম এন রায়ের অনুসারী। ছোট বেলায় ট্রেনে একটা হাত কাটা পড়ে যায়। এক হাত দিয়েই দশ হাতের কাজ করতে পারেন। প্রায় সব জগতেই তার পদচারনা। যেন একটি ডিকশনারি। এমন স্বরনশক্তি খুব কম মানুষের মাঝেই আমরা দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথের কোন্ কবিতা মুখস্ত বলতে বল? যে কোন কবিতা তিনি মুখস্ত বলতে পারেন। এই মুখস্ত করার জন্য কষ্ট করতে হয়না। একবার পড়লেই তাঁর মুখস্ত হয়ে যায়। সব বিষয়েই তাঁর সমান অধিকার। তিনি কোন কাজ করেন না। এখানে ছেলের কাছে থাকেন। তাঁর দু মেয়ে এখানে। একজন লিজি রহমান। একটু পরেই দেখতে পাবে। সেও ভাল গল্প লেখে।

ড: জ্যোতি প্রকাশ দত্ত। প্রতিষ্ঠিত লেখক। বাংলা একাডেমী এওয়ার্ড প্রাপ্ত। গল্প উপন্যাস লেখেন। ইনি হলেন পূরবী দত্ত। তিনিও একজন প্রতিষ্ঠিত লেখিকা। আর এ হল আমাদের হাসান ফেরদৌস। চাকরি করেন ইউ এন ও-তে। ভাল প্রবন্ধকার।

তারপর একে একে আরও এলেন ডঃ ধনঞ্জয় সাহা, মোহন গোমেজ, সলিমুল্লা খান, কাজী ফয়সল, ফয়সল খান, আলম খোরশেদ, সামস আল মমিন, জাহানার আখতার, শিকদার হুমায়ুন কবির, কৌশিক আহাম্মদ, কাজী সামসুল হক, নাজমুল আহসান, এম এম মহসীন, তারেক মাহবুব, ফরিদা সরকার, ডঃ ফরিদা মজিদ, আজাদ আহম্মদ, আলেয়া চৌধুরী,আব্দুল্লা ফিরোজ, আবু সাইদ শাহিন, ডঃ আকরাম হোসেন, ফকির ইলিয়াস, নাসরিন চৌধুরী, রিঙ্কি আরো অনেকে।

ডঃ ধনঞ্জয় চাকরি করেন একটা হসপিটালে। কুকুরের উপর একটা থিসিস লিখে বিখ্যাত হয়েছেন। ভাল কবিতা লেখেন। মোহন গোমজ লেখেন গল্প। ব্যবসা করেন।

সলিমুল্লা খান এখানে এসেছেন ইকনমিক্সে ডক্টরেট করার জন্য। বিদ্যার সাগর। যে কোন বিষয়ে তার সমান দখল। গল্প,কবিতা, প্রবন্ধ সককিছুতেই তার সমান দখল। আলম খোরশেদ একজন অনুবাদক। বিদেশি সাহিত্যকে বাংলায় অনুবাদ করেন। স্পেনিশ ভাষায় বিশেষ দখল তার। অনেকগুলো বই অনুবাদ করেছেন। শামস আল মমিন একজন কবি। স্কুলের শিক্ষক। জাহানারা আখতার একজন কবি। তিনিও শিক্ষক। শিকদার হুমায়ুন কাজ করে সাপ্তাহিক প্রবাসীতে। গল্প লেখে। কৌশিক আহাম্মদ বাঙালী পত্রিকার সম্পাদক। কাজী সামসুল হক একটা পত্রিকা চালাতেন বিশ্ব বাংলা। ইদানিং বন্ধ। নাজমুল আহসান সাপ্তাহিক পরিচয়ের সম্পাদক। মহসীন সাহেব ভাল প্রবন্ধ লেখক। তারেক মাহবুব একজন সাহিত্যামোদি। ফরিদা সরকার একজন কবি। ডঃ ফরিদা মজিদ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। ভাল কবিতা, প্রবন্ধ লেখক। আজাদ, ফিরোজ ও শাহীন ও ফকির ইলিয়াস কবি। ডঃ আকরাম দাঁতের ডাক্তার। গল্পকার। দেখবে আরও বেশ কয়েকজন আসবে তারা সাহিত্যামোদি, সতর্ক পাঠক। তারপর সকলকে লক্ষ্য করে বলল,

সেলফ সার্ভিস, সবাই যার যার চা নিয়ে বসে পড়ুন। আমি ওদিকটা একটু দেখছি।

মালেক সাহেব খুব পাকা কুক। তিনি এগিয়ে গেলেন কি রান্না হবে দেখতে। বললেন, আমিও রান্নায় সাহায্য করব।

বাহার বলল, আপনার জন্য একটা আইটেম আছে, আর তা হল ডাল।

মালেক সাহেব বললেন, ঠিক আছে। তাই করব।

ওদিকে সলিমুল্লা খান আর খন্দকার আলমগীর শুরু করেছে। যুদ্ধ। তাদের দেখা হলেই এই যুদ্ধ হয়। সবাই জানে। সলিমুল্লা বলছে, কিছু গরীব দুঃখীকে সাহায্য করুন। এত টাকা পয়সা দিয়ে কি করবেন? মরলে তো সাথে নিয়ে যাবেন না। ছেলেপেলে নেই। কে খাবে এসব টাকা?

কোথায় দেখলে তুমি আমার টাকা?

হিসাব করলেই তো পাওয়া যায়। তিরিশ বছর যাবৎ এই হসপিটালে চাকরি করছেন। বছরে বেতন ৮০ হাজার থেকে শুরু করে এখন দাড়িয়েছে এক লাখ পঁচিশ হাজারে। চল্লিশ বছর বাদ দিলাম, যদি পঁচিশ বছরও ধরি, তাহলে এই এত বছরে কত টাকা হয়? আর এই টাকা কোথায়? কাকে কয় পয়সা দিয়ে সাহায্য করেছেন? নিজেও তো খরচ করতে দেখিনা। বাঁচবেন আর কয়দিন? ছাড়ুননা কিছু।

সাহিত্যের মাঝে অংক বেমানান। রস উধাও হয়ে যায়। সাহিত্যের আসরে টাকার অংক না করলেই রস বজায় থাকবে, মালেক সাহেব এসে বললেন। চল এবার একটা কবিতা দিয়ে আসর শুরু করি বলে তিনি 'পৃথিবী' কবিতা মুখস্ত বলতে শুরু করলেন। আবৃত্তি শেষ হতেই হাসান শুরু করল তার স্বরচিত কবিতা। তার উপর আলোচনা করলেন সলিমুল্লা খান। হাসান বেজার হয়ে গেল।

আলমগীর সাহেব বললেন, সমালোচনা গ্রহন করার মনোবৃত্তি থাকতে হবে, না হয় তুমি কোনদিনই বড় কবি হতে পারবেনা। সমালোচনা কি হচ্ছে সেটা লক্ষ কর। যদি মনে কর তোমার কবিতা শুধু তোমার জন্যই তাহলে অন্য কথা। পাঠক হিসেবে আলোচনা সমালোচনা হবে, তোমার সেগুলো খতিয়ে দেখতে হবে। যেখানে যা সংকোচন বা সংযোজন মনে কর তা করবে। তবেই না তা পাকা হবে।

শামস আল মমিন বলল, দুএকটা শব্দ পরিবর্তন করলে কেমন হয়? এই যেমন 'তব', 'তরে' এগুলো। এমনি আলোচনার পর হাসানের বেজার ভাবটা কেটে গেল। শুরু করল খন্দকার আলমগীর তাঁর প্রবন্ধ। বাংলাদেশের রাজনৈতিক হালচাল। পড়ার পর হাসান বলল, এটা একপেশে হয়ে গেছে, সোজাসুজি আওয়ামীলীগকে আক্রমন করা হয়েছে।

সকলেই জানে আলমগীর সাহেব আওয়ামীলীগের বিরুদ্ধে কথা বলেন। এজন্য অনেক জায়গায় তাকে অনেক ঝামেলায়ও পড়তে হয়েছে। কিন্তু মৌলবাদের কট্টর বিরোধি। তিনি এখানে টেগোর সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। এখন প্রচারে আছেন। টেগোর সোসাইটি পশ্চিম বঙ্গের বাঙালী আর আমেরিকানরা মিলে করা হয়েছে। সেখানে বাংলাদেশি একমাত্র আলমগীর ভাই। তিনি বাংলাদেশের কোন রাজনৈতিক দলকেই সমর্থন করেন না। কারন তার মতের সাথে মিলেনা। মাঝে মাঝে ভাসানীকে সমর্থন করেন। প্রবন্ধের উপর আলোচনা সমালোচনা হল। রায় হল, একপেশে উদ্দেশ্যমূলক কোন লেখা সার্বজনিন হতে পারেনা।

হাসান ফেরদৌস বলল, এই প্রবন্ধ যদি আওয়ামীলীগের কোন মিটিংএ পড়েন তাহলে আপনার খবর আছে। সকলে হো হো করে হেসে উঠল।

জ্যোতি প্রকাশ দত্ত বললেন, এই প্রবন্ধটা যদি নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে লেখা হয় তাহলে একটা উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ হবে। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু খুবই সময়োপযোগি। আপনি ভেবে দেখুন রিরাইট করতে পারেন কিনা।

আবু সাইদ সাহিনের কবিতা শুরু করার আগেই লাঞ্চ প্রস্তুতের খবর দিয়ে গেল আনিস। সাহিনের কবিতাকে সবাই মিলে অনেক টানা হেচড়া করে এক সময় ক্ষান্ত দিয়ে সবাই খাবার টেবিলে গেল। এই টেবিল রাত দশটা পর্যন্ত এমনি থাকবে। যখন যে আসবে নিজের হাতে নিয়ে খাবে।

ডাইনিং টেবিলে মাত্র ছয়টা চেয়ার। বয়স্কদের চেয়ারে বসতে দিয়ে বাকীরা দাঁড়িয়েই খাচ্ছে। খাওয়ার মাঝেও ডঃ আলমগীরকে খোচা দিতে ছাড়েনা সলিমুল্লা। বলল, এমন কনজুসের মত খাচ্ছেন কেন? এটা তো ফ্রি। পয়সা খরচ হবেনা। একটু বেশি করে খান।

তুমি কি তোমার মত আমাকে মনে কর যে ফ্রি পেলেই পাঁচ সের খাব? সব সময়ই আমি স্বল্পাহার করি। আমার অভ্যেস তুমি পাল্টাবে কি করে?

না, আমি মনে করলাম বিলের ভয়ে যদি কম খান তাই জানিয়ে দিলাম এটা ফ্রি। যাতে নিশ্চিন্তে খেতে পারেন।

বাহার এগিয়ে এল। বলল, দেখুন আলমগীর ভাই কিন্তু কোনদিন খালি হাতে আমার বাসায় আসেনা। অন্তত একটা কেক নিয়ে আসেন। তাহলে তিনি কনজুস হলেন কিভাবে?

এখানে সারাদিন থাকবে ফ্রি খাবে তাই বোধ হয় কিছু নিয়ে এসেছে। সলিমুল্লা বলল।

ডঃ আলমগীর বললেন, যেখানে প্রয়োজন সেখানে আমি খরচ করি। অপ্রয়োজনিয় খরচ আমি করিনা। তোমার ভাগে এখনও কিছু পড়েনি তাই এত কথা বলছ। বিয়ে শাদি কর ঠিকই কিছু পাবে।

খাওয়া শেষ না হতেই এসে পৌছল কবি মোহিত চৌধুরি। এসেই যোগ দিল খাবার টেবিলে। খাওয়া শেষ হলে পর আবার শুরু হল আসর।

প্রত্যেকের লেখা পাঠ হচ্ছে, আলোচনা হচ্ছে। মাঝে মাঝে কৌতুক চলছে। এমন একটা পরিবেশে আনিসের ইচ্ছে হল সেও কিছু লেখে, সকলের সাথে যোগ দেয় একটা কিছু নিয়ে। কিন্তু কি নিয়ে? এক পাশে বসে বসে সব শুনছে, লক্ষ্য করছে। সন্ধ্যার দিকে আরও কয়েকজন যোগ দিল। এর মাঝে চা কফি চলছে। সবশেষে গল্প পড়েন ডঃ আকরাম।

ডঃ আকরাম গল্প শুরু করার আগে ভুমিকা দিলেন। এই গল্পটা এখানকার ঘটনা। কিরন নামে আমার এক বন্ধু রিয়েল এষ্টেট করেন। গত মাসে এক মিলাদ মাহফিলে গিয়ে তার কাছ থেকে যা শুনেছি তা হুবুহ বলছি।

গল্পের নাম সেকশন এইট

বিথী ঘরে ঢুকেই প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, এ লোকগুলোর কি কোন কাজ নেই? সকালে যখন ঘড়ির কাটা ধরে বাতাসে ভর করে ছুটতে ছুটতে কাজে যাই তখন দেখি ওরা প্রাত:ভ্রমন করছে, বিকেলে যখন ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে কাজ থেকে ফিরি তখন দেখি দুজনে হাত ধরাধরি করে

সান্ধ্য হাওয়া খাচ্ছে। ওরা কী? কোন কাজ করেনা? ওদের চলে কি করে?

বিথী কাজ থেকে ফিরে অনেকক্ষন কথা বলেনা। গোসল করে খেয়েদেয়ে অনেকক্ষন পরে আস্তে আস্তে তার অসুবিধার কথা বলে। আজ ঘরে ঢুকেই পরের ব্যাপার নিয়ে রুক্ষস্বরে এতগুলো কথা বলে ফেলল। মনে হল তাদের এত সুখ তার হিংসার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষ যেখানে রাতদিন কাজ করেও সংসার চালাতে হিমসিম খাচ্ছে সেখানে চোখের সামনে একটা পরিবার এত সুখে, এমন আনন্দে হাত ধরাধরি করে ঘুরে বেড়াবে তা হিংসার ব্যাপারই বটে!

কিরন ভাবল ব্যপারটা শুধু তার চোখেই পড়েনি, অনেকেরই চোখে পড়েছে হয়ত। যখনই বাঙালি গ্রোসারিতে যায় তখনই দেখে ওরা কেনাকাটা করছে। যা আমরা মনে করি অনেক দাম, সে সব জিনিষ তারা যথেষ্ট পরিমানে অবলীলায় কিনে নেয়। দুজনের যা প্রয়োজন তার তুলনায় অনেক বেশি। তাদের এপার্টমেন্টের উল্টোদিকে থাকে বলে তারা যতক্ষন ঘরে থাকে ততক্ষন তাদের নজরে ওরা পড়ে। ওরা প্রাত:ভ্রমন আর সান্ধ্য হাওয়া যে হারে সেবন করছে তাতে মনে হয় পৃথিবীর কোন চিন্তা ভাবনা, দু:খ কষ্ট তাদের কাছে পৌঁছতে পারেনি। এই সুখি মানুষের একটা দোষ, তারা জানেনা যে তাদের অপরিসীম সুখ অকারনে প্রতিবেশির দুখের কারন হয়ে দাড়াতে পারে। তাই বিথীকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বলল, কি জানি, হয়ত অনেক টাকার মালিক। বাংলাদেশ থেকে কোটি টাকা নিয়ে এসেছে। বড়লোক মানুষ। কাজের প্রয়োজন নেই। তাই হাওয়া খায়।

কদ্দিন হাওয়া খেতে পারে একটা পরিবার। একটা বাচ্চাও তো দেখি সাথে থাকে। কত টাকা নিয়ে এসেছে? কত বছর খেতে পারে এমনি বসে বসে?

তা পারে। শুনতে পাই এমন লোকও নাকি আমেরিকায় এসেছে যাদের টাকা কোনদিনই শেষ হবেনা। কেউ এসেছে আদম ব্যাপারি করে, হাজার হাজার মানুষকে পথে বসিয়ে, কেউ এসেছে সরকারের সিন্দুক চুরি করে আবার কেউ এসেছে নিজের সবকিছু নিয়ে। বুদ্ধিমান যারা তারা এখানে এসেই ইনভেস্ট করে ফেলেছে। অতএব তাদের কাজ না করলেও চলবে। অথবা এখানে দুনম্বরি কাজ এমনভাবে ফেঁদে বসেছে যার টাকা খরচ করে শেষ করতে পারছেনা। বাদ দাও ওসব। অন্যের চিন্তা করে নিজের মাথা নষ্ট করে লাভ নেই। নিজের চিন্তা কর।

কিন্তু এর শেষ হয়নি। রাতে বিছানায় শুয়ে কথা বলতে বলতে ঘুমানোর অভ্যেস কিরনের। অনেক কথার মাঝে ঘুরে ফিরে সেই পরিবারের কথা এসে যায়। প্রতি রাতেই তাদের কথা এসে যায়। কোন না কোন ভাবে। আজকে মহিলার পরনে কি কাপড় ছিল, দাম কত হতে পারে। কাপড়টা কি জেকসন হাইট থেকে কেনা, নাকি বাংলাদেশ থেকে। লোকটার পরনে কি কাপড়, কত দাম হতে পারে। লোকটা সাথে মহিলাকে কেমন মানায়। এমনি অনেক কথা। কিরন যত চেস্টাই করে কথার মোড় অন্যদিকে ঘুরাবার ততই ঘুরেফিরে সেদিকে চলে যায়।

একদিন খেয়াল করে দেখল বিথী সবকিছুতেই উদাসিন হয়ে পড়ছে। যখনই সেই পরিবারটা সামনে পরে তখন বিথী আনমনা হয়ে যায়। কাজ ছাড়া যে কোনদিন থাকতে পারেনা সেই যেন হয়ে পড়েছে অলস। কিরন বুঝল তার সংসারে ঘুনে ধরেছে। এর থেকে রেহাই পেতে হবে। মনে মনে উপায় খুজতে লাগল।

কিছুদিন পরই পাশের ব্লকে একটা ডাকাতি হয়ে গেল। একেবারে দিনে দুপুরে ডাকাতি। আলম ভাই বেড়াতে এসেছিল। বিকেল চারটা। বাচ্চারা বাইরে খেলছে। এসময় তিনজন লোক এসে ঘরে ঢুকল। একজনের হাত একটা ছোরা, একজনের হাতে পিস্তল। আর একজনের হাতে একটা ব্যাট। এসেই বলল, তোমরা ফ্লোরের উপর হয়ে শুয়ে পড়। যেই বলা, সেই কাজ। তারপর তারা আধ ঘন্টা যাবত ঘরের আনাচে কানাচে তন্ন তন্ন করে খুজে টাকা পয়সা বেশি পায়নি। শ'দুয়েক ছিল। তারপর তার স্ত্রীর হাতের বালা, টেলিভিশন, ভিসিআর নিয়ে গান গাইতে গাইতে চলে গেল। তারা শুধু তাকিয়ে দেখল। অসহায়। এই সুযোগে বাসা বদল করে প্রায় দশ মাইল দূরে চলে গেল। যাক, আপদ থেকে দূরে গিয়ে বাঁচা গেল।

কিরনের অফিসের দেয়াল কাঁচের। এমন কাঁচ যা বাইরে থেকে অফিসের ভেতরে কিছুই দেখা যায়না। কিন্তু ভেতর থেকে বাইরে স্পষ্ট দেখতে পায়। কিরনের টেবিলটা একবারে দেয়ালের পাশে। সামনে তাকালেই বাইরে অনেকদূর দেখা যায়। বাইরে জানালার নীচেই রাস্তার পাশে একটা পাবলিক টেলিফোন। একটা কোয়ার্টার দিয়ে যার ইচ্ছে সেই কথা বলতে পারে। একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। সময় শেষ হয়ে গেলে আরও পয়সা দিতে হয়। কিরন দেখে। অনেকেই আসে। কেউ আসে টেলিফোন করতে, কেউ আসে টেলিফোনের পয়সা নিতে। একটা লোক আসে প্রতিদিন এগারটার সময়। হাতে একটা স্ক্রু ড্রাইভার। এসেই স্ক্রু ড্রাইভারটা ঢুকিয়ে দেয় যেখান দিয়ে পয়সা পরে সেখানে। এদিক সেদিক কয়েকটা গুতো দেয়। তারপর উপর দিকে যেখানে পয়সা ভেতরে দিতে হয় সেখানে ঢুকিয়ে ঝাকি দেয়। কোনদিন কিছু পকেটে রাখে, কোনদিন খালি হাতে যায়। এটা তার পেশা। পৃথিবীতে কতরকমের পেশা আছে!

প্রতিদিন কিছু সুন্দরি আসে। রাজরাণী সেজে। পথ আলো করে। উচ্ছল হাসিতে ভরপুর তাদের চাঁদমুখ। তাদের দামি সুগন্ধি বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে চারদিক। মনে হয় দেয়ালের কাঁচ ভেদ করে অফিসে ঢুকে নাকে একটা ধাক্কা দিয়ে যায়। পথচারী হঠাৎ থমকে দাড়ায়। মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। অর্ধনগ্ন পোষাকের ভাজে ভাজে কিসের হাতছানি। দৃষ্টি ফেরেনা।

কয়েকজন মিলে এক সাথে আসে। প্রতিদিন নয়টার সময় যে তিনজন আসে তাদের বয়স বিশ থেকে তেইশের মাঝে। কার চেয়ে কে বেশি সুন্দরি বলা মুস্কিল। তারা অকারণে হাসে। হাসতে হাসতে একজনের গায়ে আর এক জন লুটিয়ে পড়ে। খেয়াল করে দেখলাম একজনের তিনটা বাচ্ছা, আর দুজনের চারটা করে। সকাল নয়টায় এসে টেলিফোনটা হাতে নেয়। একজন টেলিফোনে থাকে বাকী দুজন বাচ্চাদের পাহারা দেয়। কথা বলতে বলতে সে যখন হাপিয়ে যায় তখন আর একজন যায়। এমনি পালা করে তারা কথা বলে। বেলা তিনটা পর্যন্ত চলতে থাকে তাদের কথা। কথা বলে আর হাসে। হাসতে হাসতে তাদের চোখ দিয়ে পানি পড়ে। এক সময় শেষ করে। আবার ফিরে আসে পাঁচটায়। হাসি আর কথা চলতে থাকে ছয়টা সাতটা পর্যন্ত।

কিরন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। তাদের অংগভঙি, চোখের চাহনি সব দেখে। একসময় আনমনা হয়ে যায়। সুন্দরের ধ্যান করতে করতে একসময় তার কাজ ভুলে যায়। মনে মনে বলে, তারা কত সুখী। কোন কাজ করতে হয়না। তাদের নুন আনতে পান্তা ফুরায়না। হেসে খেলেই তাদের জীবন কাটে। বিথীর কথা মনে হয় মাঝে মাঝে। তখনই মনে

পড়ে আগের বাসার সামনের বাঙালি পরিবারের কথা। বিথীর হিংসে হত। আর এই মহিলাগুলোর সুখ দেখে তার নিজেরও যেন হিংসার উদ্রেক হল মনে। এত সুখ তাদের!

হঠাৎ মনে হল ওরা রাস্তায় আসে কেন ফোন করতে? ঘর থেকে কথা বলতে পারেনা? দিনের পর দিন এমনি শুধু কথা বলে তাদের চলে কি করে? তাদের কি কোনই কাজ নেই?

সহকর্মি জুলিকে জিজ্ঞেস করল একদিন। জুলি, তুমি কি খেয়াল করেছ ওই মহিলাগুলোকে? সারাদিন শুধু টেলিফোন আর টেলিফোন! ওরা কারা? ওদের চলে কিসে?

জুলি বলল, ওরা সেকশন এইট।

সেকশন এইট? ওটা আবার কি জিনিষ?

সেকশন এইট জাননা? কতদিন আছ আমেরিকায়? কে তোমাকে থাকতে দিয়েছে এ দেশে?

এ ধরনের কোন শব্দের সাথেই আমার পরিচয় নেই। একটু বুঝিয়ে বলনা।

তবে শোন বলে জুলি চেয়ারে একটু আরাম করে বসল। বলতে লাগল: সেকশন এইট হল আমেরিকান সরকারের আনএমপ্লয়মেন্ট এ্যাক্টের আট নম্বর সেকশন। তাতে বলা হয়েছে যে, যদি কোন নাগরিক বেকার থাকে এবং তার নাবালক সন্তান থাকে তাহলে সরকার তাকে এই সুযোগসুবিধাগুলো দিতে বাধ্য থাকবে:

(এক) ঘরভাড়া: প্রতি সদস্যের জন্য একটা করে বেডরুম সহ বাড়ীভাড়া প্রতি মাসে যা প্রয়োজন তাই দিতে হবে। এই মহামান্য বেকার নাগরিকরা তাদের পছন্দমত বাড়ী ঠিক করে সরকারের ওয়েলফেয়ার বিভাগকে জানাবে আর ওয়েলফেয়ার বিভাগ যথাসময়ে প্রতিমাসে ঘরভাড়াটা পাঠিয়ে দিবে।তারা যে বাড়ীতে ভাড়া থাকবে সে বাড়ী যথেচ্ছা ব্যবহার করতে পারবে।বাড়ীর যত ব্যবহারিক জিনিষপত্র আছে তা ভাঙবে, যেসব জিনিষ খুলে বিক্রি করা যায় তা বিক্রি করবে। বাড়ীর মালিক কিছুই বলতে পারবেনা। যদি কিছু বলে তাহলে জীবনের প্রতি হুমকি আসবে। তা না হলে আদালতে নালিশ করবে। মানে এমন সব ঘটনা এবং পরিবেশ সৃষ্টি হবে যাতে বাড়ীর মালিক বাড়ী ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে। আদালত কোন অবস্থাতেই বাড়ীওয়ালার পক্ষ নিতে পারবেনা।

(দুই) এই বেকার রত্নরা বেকার ভাতা পাবে। বেকার ভাতা দুপ্রকার। যদি কেউ আংশিক কাজ করে তাহলে আংশিক ভাতা, পূর্ন বেকার হলে পূর্ণ ভাতা পাবে।

(তিন) সন্তান পালনের ভাতা ; সন্তানের বয়স আঠার না হওয়া পর্যন্ত প্রতি সন্তান পিছু পাঁচশত ডলার দেয়া হবে।

(চার) অন্ন সংস্থানের জন্য ফুড ষ্টাম্প দেয়া হবে মাথাপিছু তিনশত ডলারের সমপরিমান।

আঠার বছর পর্যন্ত সন্তান পালন করতে করতে পিতামাতা হয়ে পড়বে বৃদ্ধ। বৃদ্ধ হওয়া মানে সিনিওর সিটিজেন। সিনিওর সিটিজেন হওয়া মানে স্বর্গলাভ। সিনিওর সিটিজেনের জন্য আলাদা ইমারত আছে। সরকার তাদের ভরনপোষনের সব ব্যবস্থা করবে। এবার বুঝলে সেকশন এইট কি?

এই বলে জুলি থামল। কিরন থ হয়ে বসে রইল!

কিছুদিন পর আগে যে বাসায় থাকত তার প্রতিবেশি নুরুল হকের বাসায় মিলাদের দাওয়াত। যথাসময়ে বিথীকে নিয়ে কিরন মিলাদে

সামিল হল। এদেশের মিলাদটা একটু পোক্ত ধরনের হয়। শুধু কলা চানাচুড় নয়। যথেষ্ট পরিমানে উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করা হয়। মিলাদ শেষে ভুরিভোজনে আপ্যায়ন করার নিয়ম। তারা বাসায় পৌছে দেখে এলাহি কান্ড! যেন বিয়ে বাড়ী। বাচ্চা ছেলেমেয়ে পুরুষ মহিলা একবারে গিজ গিজ করছে। লিভিং রুমে বেশ কয়েকজন পুরুষ, অনেকের মাথায় টুপি। মদিনা মসজিদের ঈমাম মাঝখানে একটা চেয়ারে বসে আছেন। মৃদু তালে কথাবার্তা চলছে। ধর্মীয়। ভেতরের মহলে মহিলাদের কলকাকলি, ছেলে মেয়েদের চিৎকার ছুটাছুটিতে আলোচনার ব্যাঘাত হচ্ছে। মেয়ে মহলেই কোলাহলটা বেশি। অনেক ধরনের কন্ঠ এক সাথে বাজছে। কে যে বক্তা আর কে যে শ্রোতা বুঝা যাচ্ছে না। খবর আদান প্রদান হচ্ছে। এই ইলেকট্রনিকের যুগে যেখানে মুহূর্তে বিশ্বব্যাপী খবর আদান প্রদান হয় তার চেয়ে দ্রুত খবর আদান প্রদান হয় মহিলাদের মাধ্যমে। এই মিলাদের মাহফিলে মিলাদ পড়বে পুরুষরা। মহিলারা একত্রিত হয়েছে তাদের খবর আদান প্রদানের জন্য।

এক সময় মাহফিল শেষ হল। ভুড়িভোজন শেষে যে যার বাসায় যাচ্ছে। কিরন বিদায় নিয়ে গাড়ীর দিকে রওয়ানা দিল। পথেই বিথী বলল, খবর শুনেছ?

কি খবর? বলে কিরন গাড়ীর দরজা খুলে ভেতরে বসে গাড়ী ষ্টার্ট দিল।

বিথী দরজা খুলে এক পা ভিতরে আর এক পা বাইরে রেখেই বলল, সেই হাওয়া খাওয়ার ব্যাপারটা শুনেছ?

বিথীর চেহারাটা আনন্দে চিক চিক করছে। মনে হল পৃথিবীর সব চেয়ে সুখের একটা জিনিষ সে আহরন করেছে। কতক্ষনে ছাড়বে তার তর সইছে না। বিথীকে বলল, আগে ভিতরে ঢোক, তারপর বল তোমার খবর।

বিথী ভিতরে বসেই বলল, শুনেছ সেই হাওয়া খাওয়া পরিবারের কথা? লোকটা নাকি বাংলাদেশে রাজাকার ছিল। বোষ্টন থেকে পলা ভাবীর ভাই এসেছিল। সে চিনে ফেলেছে আর একটা হৈ চৈ লেগে গেছে। সে নাকি লোকটাকে মারতে গিয়েছিল। তারপর পুলিশে খবর দিয়েছে। রাতারাতি তারা বাসা ছেড়ে চলে গেছে। পরের দিন নাকি সেকশন এইটের লোক এসেছিল। সেকশন এইট কি?

ওটাই তো হাওয়া খাওয়ার উৎস! কিরন বলল। রাজাকার সবখানেই রাজাকার! যুগে যুগে!

গল্প শেষ হল। সকলেই যার যার মতামত প্রকাশ করল। ড: জ্যোতি প্রকাশ দত্ত বললেন, বেশ সুন্দর গল্প হয়েছে। যে কোন পত্রিকায় পাঠিয়ে দিন।

-৪৩-

বাসায় একজন মেহমান থাকলে তার দিকে খেয়াল রাখতে হয় এটা আমাদের সমাজের রীতি। এই খেয়াল রাখাটা গৃহকর্ত্রীর উপরই বর্তায়। হোক সে পেয়িং বা নন-পেয়িং। রনি লতিফের বাসায় পেয়িং গেস্ট হিসেবে আছে। তার খাওয়া দাওয়া থেকে সুযোগ সুবিধা দেখা লতিফের সময় হয়না। বেচারা সন্ধ্যা চারটায় বেরিয়ে যায়, সারা রাত টেক্সি চালিয়ে ভোর ছয়টায় ঘরে ফিরে। কোনদিন কিছু মুখে দেয়, কোন দিন না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ে। বেলা তিনটা পর্যন্ত ঘুমায়। ঘুম কম হলে রাতে টেক্সি চালাতে অসুবিধা হয়। ঘুম ঘুম চোখে গাড়ী চালানো

বিপদজনক। এই ঘুম ঘুম চোখে গাড়ী চালাতে গিয়ে এই কিছুদিন আগে চারটি জীবন শেষ হয়ে গেছে। নব বিবাহিত যুগল সহিদ আর রুমা তাদের দু বন্ধু। রাতে গাড়ি চালিয়ে আসছিল বোষ্টন থেকে। হাইওয়ে ধরে। কোন সময় যে চোখের পাতা মুহূর্তে জন্য লেগে গেছে টের পায়নি। আর মুহূর্তে গাড়ী রাস্তার পাশে ইলেকট্রিক পোলে ধাক্কা লেগে একবারে চুরমার। গাড়ী কেটে মৃতদেহ বের করতে হয়েছে। তাই লতিফ চেষ্টা করে ঘুম যাতে ঠিকমত হয়। তার প্রয়োজন টাকা রোজগার করা, ছন্দার একাউন্টে জমা করা। সংসারের আর যা কাজ সব করে ছন্দা।

বাজার করা থেকে রান্না বান্না সব করে ছন্দা। ব্যাংকের কাজ কর্মও ছন্দা করে। যে ছন্দা রান্নাকে এত ভয় পেত, কিছুই জানতনা সে এখন রান্নায় পটু। প্রয়োজনে অনেক কিছুই শেখা যায়। রান্না শেখার কিছু কারনও আছে। ঘরে একজন মেহমান আছে। তার কাছ থেকে যে ভাড়া এবং খাওয়া খরচ পায় তা তাদের অর্ধেকের বেশি পুষিয়ে যায়। কাজেই তার খাবারের দিকে নজর দিতে হয়। এখন যেন এই রান্না করা তার একটা বড় দায়ীত্ব হয়ে দাড়িয়েছে। রনিকে খুশি করার জন্য।

রনি খুব কম কথা বলে। খুব লাজুক। ভাল মন্দ কিছুই বলেনা। কিন্তু ছন্দা বুঝতে পারে কোন খাবারটা তার ভাল লেগেছে। কি ধরনের খাবার সে পছন্দ করে। খালা চিঠিতে লিখেছিল, রনি কিছু চাইতে জানে না। কারন না চাইতেই সে সবকিছু পেয়ে আসছে। কাষ্টমস অফিসারের একমাত্র সন্তান। অতএব টাকার অভাব নেই। তুমি তার দিকে সব সময় খেয়াল রাখবে। তাই ছন্দা খেয়াল রাখছে সর্বদা।

ছন্দা যখন কেনা কাটা করতে যায় তখন রনি সাথে থাকে। যখন তখন বাজারে যায়। বাজারের বেগ থাকে রনির হাতে। ছন্দা ছন্দের তালে তালে হাটে। মন চলে ছন্দের ছন্দে। তার একাউন্টে এখন আশি হাজারের মত জমা আছে। যখন যা ইচ্ছা কিনতে পারছে। নিত্য নুতন পোষাক, গহনা। সপ্তাহে তিন চার দিন যায় জেকসন হাইটসে। ওখানে শাড়ীর রম রমা ব্যবসা। পছন্দমত কেনা যায়। তারা দুজনকে অপরিচিত মানুষ যখন দেখে তখন ভাবে নিশ্চয়ই এরা স্বামীস্ত্রী।

রনি ছন্দাকে আপা বলে ডাকে। ছন্দা ডাকে রনি ভাই বলে। রনির খাওয়া দাওয়ার প্রতি ছন্দা বিশেষ নজর রাখে। কম খেলে পাতে তুলে দিয়ে বলে এইটুকু শেষ করতে হবে। অনেক রাত পর্যন্ত টেলিভিশন অথবা হিন্দি বা বাংলা ছবি দেখে।

রনির ঠান্ডা লেগে একবারে নিউমুনিয়ার মত হয়ে গেছে। এদেশের ঠান্ডা সম্মন্ধে রনির যা ধারনা ছিল তা ডিসেম্বর মাসে বুঝতে পারল এর পরিধি শতগুন। সেদিন ক্লাশে গিয়েছিল শীতের পুরো পোষাক পরে। পেন্টের নীচে থারমল, গরম পশমী কাপড়ের প্যান্ট, গায়ে একটা মোটা গেঞ্জি, তার উপর মোটা সার্ট, তার উপর সোয়েটার, সব শেষে ওভারকোট। এত সব পোষাকেও ঠান্ডা লেগে যাওয়া থেকে রক্ষা পায়নি। দিনটা ছিল উজ্জল, ঝলমলে রোদ। বাইরে না গেলে কিছুতেই বোঝা যায়না যে এখন মায়নাস ২০ এবং উইন্ড চিল মায়নাস ৪০। মুখের থুতু ফেলার সাথে সাথে বরফ হয়ে নীচে পড়ে। সেই অবস্থায় ঘরে ফেরার পথে রনির ঠান্ডা লেগে যায়। রাতে একটু একটু জ্বর, পরের দিন আরও বেশি। পরের দিন রাতে কাপুনি দিয়ে জ্বর। সাথে ভীষন মাথা ব্যথা। দুটা কম্বল দিয়েও তার কাপুনী থামেনি। এই বিদেশে তার আপন কেউ নেই। তাই ছন্দা যতটুকু পারে সেবা করছে। তার মাথা টিপে দিচ্ছে, মাথা ব্যথার মালিশ দিচ্ছে। কিছুতেই কিছু হচ্ছেনা। তখন রনির উপর নিজেই শুয়ে তাকে আকড়ে ধরে পরে রইল। যদি জ্বরটা সেরে

যায়। কাপনি থেমে যায়! তার নিজের শরীরের গরমে। অনেক ক্ষন। এক সময় জিজ্ঞেস করল, রনি ভাই, জ্বর একটু কমেছে মনে হয়?

রনি মুখ খুলল। বলল, আমি শীত সহ্য করতে পারিনা। একটুতেই ঠান্ডা লেগে যায়। বাংলাদেশে বছরে কয়েক বার আমার ঠান্ডা লাগার অভ্যাস আছে। এখন জ্বর কমেছে বলে মনে হয়না।

তাহলে আরও কিছুক্ষন ধরে রাখি।

এমনি ভারে সারা রাত ছন্দা রনিকে তার শরীরের তাপ দিয়ে সুস্থ করার আপ্রান চেষ্টা করল। যে রনি মুখে খুব কথা বলেনা, তখন তার হাত যথেষ্ট সক্রিয় হয়ে উঠল। যেখানে সেখানে চলতে লাগল। সাত দিনের মধ্যেই রনি সেরে উঠল এই বিশেষ চিকিৎসা দ্বারা।

এই চিকিৎসা কতদিন থেকে চলে আসছে তা কেউ জানে না। আরও কত দিন চলবে সেও অনুমান করা যায় না। কিন্তু ঘটনা ধরা পড়ে যায়।

সেদিন লতিফের গাড়ী হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। রাত তখন দুটা। কোম্পানীর আদেশ হল, গাড়ী যেখানে খারাপ হবে সেখানেই থাকবে। সাথে সাথে কোম্পানীর কাছে ফোন করে বলে দিতে হবে কোথায়, কতটার সময়, কোন জায়গায় গাড়ি খারাপ হয়েছে। তারপর সেই মহূর্তে অন্য কোন গাড়ীর ব্যবস্থা করা যাবেনা। ড্রাইভার বাড়ী চলে যাবে।

এই কোম্পানীর গাড়ী পঞ্চাশটা। দিনে রাতে চলে। অফিসে তিনজন লোক চব্বিশ ঘন্টা ব্যস্ত থাকে শুধু ড্রাইভারদের অভিযোগ রেকর্ড করার জন্য। রিপোর্ট পাবার সাথে সাথে কোম্পানীর টো গাড়ী চলে যাবে গাড়ী নিয়ে আসার জন্য। সোজা নিয়ে যাবে গেরাজে, মেরামত করার জন্য। লতিফ কোম্পানীকে রিপোর্ট করে হাতে ব্যাগ নিয়ে বাসায় চলে এল।

এত রাতে ছন্দাকে ডেকে ঘুম ভাঙানো উচিত বলে মনে করেনি লতিফ। দরজা খুলে লিভিং রুম পার হয়ে বেড রুমে ঢুকে লাইট জ্বালতেই রনি আর ছন্দা ধড়ফড় করে উঠে বসল। ছন্দা কম্বল দিয়ে তার বদনখানা ঢাকবার চেষ্টা করছে। রনি তাড়াতাড়ি লুঙ্গিটা পেচিয়ে চট করে বেরিয়ে তার রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

লতিফ কিছু বুঝতে পারছেনা। সে কি ঘুমিয়ে না জেগে । এ কি স্বপ্ন! না সত্যি! এ কী করে সম্ভব! এখন সে কি করবে! ছন্দাকে খুন করবে না রনিকে? খুন করে থানায় চলে যাবে! বলবে আমি আমার স্ত্রীকে খুন করে এসেছি! নাকি দুজনকেই খুন করবে! এখনি তালাক দিয়ে দেবে? কি করবে সে স্থির করতে পারছেনা। হাতের ব্যাগটা পড়ে গেল। সেও বসে পড়ল কার্পেটের উপর। প্রায় অচেতন। ছন্দা তার পেটিকোট পরে তার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। কোন কথা নেই। বাথরুমের দরজা বন্ধ হবার শব্দ শোনা গেল একটু পরে। লতিফ কিচেনে গেল। একটা ছুরি হাতে নিয়ে ভাবছে কোন্‌টাকে আগে খুন করবে। তার আগে পুলিশ ডাকবে! না, পুলিশ এসে বরং তাকেই বলবে চলে যেতে। এখানে স্বামীর কোন দাম নেই যতক্ষন স্ত্রী তার কথা না বলবে। এখন ছন্দা কার পক্ষে কথা বলবে? আলতাফের কথা মনে পড়ল। সে কিছুই করতে পারেনি। তার আম ছালা দুইই গেছে! যে স্ত্রী পরকীয়া করে তারা প্রস্তুত হয়েই এগিয়ে যায়। এদেশের আইন কানুন তারা মুখস্ত করে নেয়। অন্য কোন কিছুতেই মাথা না ঘামালেও নারী স্বাধীনতা কতটুকু ভোগ করা যায় তা অল্প সময়েই রপ্ত করে ফেলে। প্রয়োজনে মুহূর্তেই স্ত্রী বদলে যায়। কখন কার কেউ বলতে পারেনা! হাজার বছর এক সাথে ঘর করেও। নারী কি নিজেও জানে সে কখন কার? কাকে কি কারনে কখন ভাল লাগবে! এখানে নারীরা স্বাধীন।

স্বামী বা বন্ধু নির্বাচনে। পুরুষ অসহায়। সে এখন কি করবে! খুন করলে কি হবে? সারাজীবন জেলে কাটবে। জীবনটা পড়ে আছে। নতুন করে আবার কি শুরু করা যায়না? এমন ছন্দার কি অভাব আছে পৃথিবীতে? আলতাফের দুর্দশার কথা তার মনে পড়ে। বেচারা এখন না ঘাটকা না ঘরকা। না পারছে দেশে ফিরে যেতে, না পারছে এখানে শান্তিতে বসবাস করতে। একদিকে সন্তানের মায়া, অন্যদিকে স্ত্রীর কারনে মানসিক জ্বালাতন। এই অপরাধের কোন বিচার করা বা সুরাহা করা সম্ভব নয়। এ ঘরে আর থাকা সম্ভব নয়। এক মুহূর্তও নয়। সে বেরিয়ে পড়ল।

কোথায় যাবে সে! আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে কখন যে সে সাবওয়েতে চলে এসেছে খেয়াল নেই। কোথায়, কোন্ ট্রেন নিবে সে! কোন গন্তব্য নেই। সাবওয়ের ভেতর বসার চেয়ারে সে বসে পড়ল। রাত এখন চারটা বাজে। সকাল হবে আটটায়। মনে মনে কত কি ভাবছে! অঙ্ক করছে। ঘরভাড়ার অঙ্ক। কিছুই মিলছেনা। এতদিনে কত টাকা ঘর ভাড়া দিয়ে লাভ হল! সে টাকার বদলে কি গেল! যা যাবার সে কি এমনি চলে যেত? না কি সুযোগের অভাবে থেমে থাকত? সেই থেমে থেকে সারাজীবন কাটিয়ে দিতে পারত? যারা যায় তারা কি এমনি চলে যায়, নাকি সুযোগ পেলে চলে যায়? সুযোগ পেলেই কি মানুষ তার ব্যবহার করে? এমনি ভাবতে ভাবতে সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ছন্দাকে তালাক দিয়ে দিবে। একদিকে সে আলতাফের চেয়ে ভাল আছে। সন্তান নেই। অন্য কোন টান নেই। শুধু ছন্দার অভাবটা কিছুদিন হয়ত অনুভব করবে। না, তা বোধ হয় আর হবেনা। কারণ সে ছন্দাকে এত ঘৃণা করে যে তাকে নিয়ে চিন্তা করতেও চায়না। এখন তার একটা আশ্রয়স্থল চাই। কোথায় যাবে এই সকালে? কে তাকে কি সাহায্য করবে! নিজকে বড় অসহায় মনে হল।

লতিফ ভাবছে কোথায় যাবে। তার খুব ঘুম পেয়েছে। তার এখন ঘর নেই, স্ত্রী নেই, টাকা নেই। কিছু নেই। বড় দুর্বল সে। বাহারের কথা মনে হল। তাকে সব বলবে। অন্তত একজনকে মনের দুঃখ বলা প্রয়োজন। মনে একটু সাহস প্রয়োজন। এখন গেলে বাহারের সাথে দেখা হবে। এখনও অফিসে যায়নি নিশ্চয়ই। ব্রুকলীনের এফ ট্রেনে উঠে বসল লতিফ।

বাহার বাথরুমে শেভ করছিল। সাবানের ফেনা লাগিয়ে প্রথমে ডান গালে রেজার চালানো তার অভ্যেস। সেই মতে ডান গালে পোঁচ দেবার সাথে সাথেই দরজার বেল বেজে উঠল। সে ভাবল এত সকালে আবার কে এল! অর্ধেক মুখ ভর্তি ফেনা নিয়েই সে এগিয়ে গেল। হু ইজ দিস?
আমি লতিফ। দরজা খুলুন।

দরজা খুলে দিতেই লতিফ কোন কথা না বলে সোজা লিভিং রুমে চলে গেল। বাহার তার চেহারার দিকে তাকিয়ে বলল, কি, তোমার মনটা ভাল নেই মনে হয়। এই এত সকালে তো কোন দিন আসনি। খারাপ কোন খবর?

লতিফ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, তুমি কখন অফিসে যাবে?

এই তো সাড়ে আটটার মধ্যে বেরিয়ে পড়ব।

আমি আজ তোমার এখানে থাকব। তুমি অফিস থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত। সোফায় ঘুমিয়ে থাকব। কোন আপত্তি নেই তো?

কি বল তুমি? তুমি সোফায় ঘুমাবে কেন? সাগরের রুমে চলে যাও। ওরা তো আসবে সেই তিনটার পর। তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পার। কিন্তু হয়েছেটা কি? ছন্দার সাথে ঝগড়া হয়েছে?
ঝগড়া না, সব শেষ হয়ে গেছে। তোমার এখন সময় নেই। অফিস থেকে ফিরলেই সব বলব। এক কাপ চা হবে?

মনে হচ্ছে তুমি খুব বেশী রেগে আছ। মাথাটা একটু ঠান্ডা কর। সব ঠিক হয়ে যাবে। বিন্দু তো বাচ্চাদের নিয়ে স্কুলে গেছে। তুমি নিজেই বানিয়ে নাও। আমার এখন সময় নেই। কিচেনে চলে যাও। নাস্তা বোধ হয আছে। সেল্‌ফ হেল্‌প। অফিস থেকে ফিরে এসে তোমার কথা শুনব।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বাহার চলে গেল অফিসে। তারপর বিন্দু ঘরে এসে দেখে সাগরের রুমের দরজা বন্ধ। উঁকি দিয়ে দেখে কম্বল মুড়ি দিয়ে কেউ শুয়ে আছে। কি ব্যাপার! ও অফিসে যায়নি! এমন তো হয়না। এগিয়ে গিয়ে দেখতে চেষ্টা করল। মাথার চুল দেখে বুঝতে পারল বাহার নয়। তাহলে কে এই সকালে এখানে! এল কখন! দরজাটা আবার ভেজিয়ে চলে আসছিল বিন্দু। লতিফ ডাক দিল, ভাবী। আমি লতিফ। আজ এখানে সারাদিন থাকব। এখন ঘুমাব। আপনার কোন অসুবিধা হবেনা।

কিন্তু লতিফ শত চেষ্টা করেও ঘুমাতে পারেনি। দাম্পত্য জীবনের একটা হিসাব করছে। যোগ, বিয়োগ, ভাগ সব রকম। ছন্দা কি চেয়েছিল, কি পায়নি। তার পক্ষ থেকে কোন কোন ভুল ছিল। ছন্দা যা চেয়েছে তাই সে করেছে। ছন্দাকে খুশি করার জন্য তার এমন ভাল চাকরিটা ছেড়ে এই বিদেশে এসে এত ছোট কাজ করছে। শুধু ছন্দার জন্য। তার কোনদিন ইচ্ছা ছিলনা বিদেশে পাড়ি দেবার। ছন্দার কোন আবদারই সে অপূর্ণ রাখেনি। তার শারীরিক গঠন খুব শক্ত। যৌনকর্মে সে ছন্দাকে সুখী করতে পারে। দেখতে সে রনির চেয়ে অনেক অনেক সুশ্রী। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে। গায়ের রংও রনির চেয়ে ফর্সা। তবে কিসের টানে ছন্দা রনিকে পছন্দ করল! এ কি ভালবাসা! তবে তার প্রতি যে ভালবাসা ছিল তা কি মেকি ছিল? সত্যিকার ভালবাসা কেমন দেখতে! কোন্‌দিন ছন্দা কি কারণে কিভাবে তাকে আদর করেছে, মুখে কি কি বলেছে সব মনে পড়ছে। সামাণ্য কথাও আজ তার কাছে বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। ফেলে আসা কত ছোটখাটো মুহূর্তগুলো আজ তাকে আনমণা করে দিচ্ছে। এ যে বিশ্বাস করা যায়না! নিজ চোখে না দেখলে কিছুতেই সে বিশ্বাস করতে পারতনা। ছন্দার উপর তার অগাধ বিশ্বাস ছিল। এমন কিছু একটা ঘটতে পারে তা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। এ কি করে সম্ভব! তার মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। রান্নাঘরে বিন্দুকে বলে গেল, আমি বাইরে যাচ্ছি ভাবী। দরজাটা বন্ধ করে দিন। আবার ফিরব।

পথে নেমে হাঁটতে লাগল। কোন গন্তব্য নেই। এখন এপ্রিল মাস। তীব্র শীতের দৌরাত্ম্য কমে গেছে। বসন্ত দ্বারে। যখন তখন আবহাওয়া উঠা নামা করে। আবহাওয়ার পূর্বাভাসে মানুষ আস্থা রাখতে পারেনা। যে কোন সময় পরিবর্তন হয়ে যায়। আবহাওয়া অফিসকেও দোষ দেয়া যায় না। তাই মানুষ শীত বস্ত্র এখনও ত্যাগ করেনি। লতিফের গায়ে একটা জ্যাকেট। দু পকেটে হাত ঢুকিয়ে সে চলছে। আর কত কি ভাবছে! সামনে দুজন সাদা চামড়ার মেয়ে পুরুষ। হাতে হাত ধরে চলছে। রাস্তার মোড়ে গিয়ে একজন আর একজনকে জড়িয়ে ধরে চুমো দিয়ে বিদায় নিচ্ছে। একজন চলে গেল সাবওয়ের দিকে, আর একজন

সোজা। এই চুমো দেয়া যেখানে সেখানে দেখে অভ্যস্থ হয়ে গেছে লতিফ। আজ মনে হল এটা একটা ঘৃণার কাজ। সব মেয়েরাই বোধ হয় এমনি বিশ্বাসঘাতক। সে আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারেনা। চলতে চলতে এক সময় চোখ তুলে দেখে সে তার বাসার সামনে এসে পড়েছে। তাইত! এখানে এল কেন সে! ছন্দাকে কিছু জিজ্ঞেস করবে? কি জিজ্ঞেস করবে? এখন আর মনে করতে পারছেনা। বাসা ছাড়িয়ে সোজা হাঁটতে লাগল। বেলা পাঁচটার দিকে ফিরে এল বাহারের বাসায়।

সাড়ে পাঁচটার দিকে বাহার ফিরল। লতিফ লিভিং রুমে বসে আছে।

কি, তোমার ঘুম হয়নি? চোখ লাল হয়ে আছে যে?

না, ঘুম হলনা। আগে আমার কথা শোন। তারপর আমাকে বল কি করতে হবে। আমি মানসিকভাবে একবারে বিপর্যস্ত। মন দিয়ে শোন আমার কথা।

সব শুনে বাহারও থ হয়ে গেল। তুমি নিজ চোখে দেখেছ?

তাহলে কি আমি বানিয়ে বলছি? আমার নিজের স্ত্রী সম্মন্ধে?

তুমি কোথায়ও ভুল করছ। ছন্দা এমন কাজ করতে পারে?

নিজের চোখকে তো অবিশ্বাস করতে পারিনা!

বিন্দু চা নিয়ে টেবিলে রাখল। জিজ্ঞেস করল, লতিফ ভাইএর কি হয়েছে? চেহারা এমন উসখু খুসকু কেন? কোন বিপদ আপদ হয়নি তো?

বিপদ নয়, তবে সংকেত। মেয়েদের মাথায় বুদ্ধি একটু বেশি কোন কোন ক্ষেত্রে। দেখতো তুমি কিছু বুঝতে পার কিনা ব্যাপারটা। বিন্দুর কাছে ঘটনা আর এক বার খুলে বলতে হল।

সব শুনে বিন্দু বলল, এটা অসম্ভব কিছু নয়। তিনি নিজ চোখে দেখেছেন। কোন তৃতীয় ব্যক্তির কথা নয় তাহলে ব্যাপারটা ভাল করে চিন্তা করতে হবে। ছন্দার সাথে আলাপ করা প্রয়োজন। না হয় এক তরফা হয়ে যায়।

এক তরফ বা দু'তরফের কথা নয় ভাবী। আমি যা দেখেছি তাই সত্যি। তার মধ্যে কোন তরফ নাই। লতিফ বলল।

তারপরও ছন্দার সাথে কথা বলতে হবে। এমন সময় দরজার বেল বেজে উঠল। বিন্দু গিয়ে জিজ্ঞেস করল, হু ইজ ইট?

আমি গরীব বান্দা আনিস।

আনিসের হাতে একটা বই। ফেরত দিয়ে আবার নিতে এসেছে।

বাহার বলল, চা আছে টেবিলে। হাত চালিয়ে নাও।

এখন কি জলসা চলছে?

বিশেষ একটা ব্যাপার নিয়ে আলোচনা চলছে। চা টা শেষ করে চল এক জায়গায় যাব। লতিফ, তুমি এখানেই অপেক্ষা কর। আমি যাব আর আসব। ধর এক ঘন্টা।

আনিসকে সাথে নিয়ে গাড়ীতে উঠল। আনিস জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবেন?

যাব লতিফের বাসায়। ঘটনা একটা ঘটে গেছে বোধ হয়। দেখি কোন রকমে জোড়াতালি দেয়া যায় কিনা। তারপর সব বলল।

অনেকক্ষণ বেল টিপার পর দরজা খুলে দিল ছন্দা নিজে। অবিন্যস্ত বিধ্বস্ত চেহারা। মনে হয় লতিফের চেয়েও খারাপ অবস্থায় আছে। দরজা খুলে দিয়ে সে চলে গেল ভেতরে। বাহার বলল, ভাবী, বেশিক্ষণ বসব না। আপনাকে শুধু দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করব। বলে সে সোফায় বসল। আনিস বসল তার উল্টোদিকে। ছন্দা এসে দরজায় ধাক্কা দিয়ে দাঁড়াল।

বাহার জিজ্ঞেস করল, লতিফ এসব কি বলছে?

একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে। রনির খুব জ্বর কয়দিন থেকে। তাকে একটু সেবা করতে গিয়েই ভুল হয়ে গেছে আমার। এখন আপনি বলুন কি করব আমি? এমন আর হবেনা। রনিকে বলব চলে যেতে।

আচ্ছা, এখন চলি। পরে আবার আসব। বলে দুজনে বেরিয়ে এল।

আনিস জিজ্ঞেস করল, কিছুই তো জিজ্ঞেস করলেন না?

বেশি কিছু জিজ্ঞাসার নেই। শুধু বাতাসটা দেখতে এলাম। বাতাস মনে হয় অনুকূলে। আলতাফের মত নয়। দেখা যাক চেষ্টা করে। তালি লাগানো যায় কিনা।

ঘরে ফিরে এসে লতিফকে নিয়ে বসল বাহার। বলল, আমি তো ছন্দার মাঝে এমন কিছু পেলাম না। সে বলেছে তার ভুল হয়েছে রনিকে সেবা করা। রনি কালই চলে যাবে তোমার ঘর ছেড়ে। এমন ছোটখাট ভুল মানুষের জীবনে হয়েই থাকে। তার জন্য সংসার শেষ করে দিতে হয়না। তুমি বাসায় যাও। তোমার যেভাবে ভাল লাগে সেভাবে চালাও সব কিছু।

না, এটা আমার দ্বারা আর সম্ভব নয় বাহার। আমি যা দেখেছি তার পর তার সাথে ঘর করা সম্ভব নয়। কোন মতেই আমি তাকে আর বিশ্বাস করতে পারবনা। যাকে নিয়ে ঘর করব তার উপর যদি বিশ্বাস না থাকে তাহলে কোন প্রাণের টান থাকেনা। যেখানে প্রাণের টান থাকে না সেখানে শুধু অভিনয় করে যাওয়া। তা আমি পারবনা।

আচ্ছা, ধর, তুমি যদি এ ঘটনা না জানতে বা এমন কিছু না দেখতে তাহলে কি হত? এমন কত মানুষই তো পরকীয়া করে পার পেয়ে যাচ্ছে। এই আমাদের আশেপাশে তাকালেই দেখবে কত ঘটনা! ঘটেছে, এখনও ঘটছে। কেউ দেখেও দেখে না, কেউ জেনেও জানে না। দেখতে গেলেই বিপদ। আবার কেউ সব নিজ হাতে ঠিক করে নেয়। কোনটা ধরা পড়ে কোনটা অজানাই থেকে যায়। আর এসব ঘটছে নিজেদের পরিচিত মহলেই। তাতে সংসারও চলে। কোন অসুবিধা হয় না। এর জন্য মহিলা যতটুকু দায়ী পুরুষ তার চেয়ে বেশি দায়ী। তোমার নিজের কথা চিন্তা কর। তুমি কি করতে এমন একটা পরিবেশে? তুমি নিজকে কতটুকু সৎ মনে কর? কতটুকু সৎ আছ জানি না। যাকে বলে ভার্জিন। পুরুষ মহিলা কে কাকে বেশি দায়ী করবে? দু তরফের মতামতেই এসব হয়ে থাকে। ধর তুমি একজন বিধবা মহিলাকে বিয়ে করলে। তখন তো তুমি জেনেই করছ যে তিনি আর এক স্বামীর সাথে সহবাস করেছে। তাহলে কি তুমি জেনেশুনে গ্রহন করছ না? আর যদি একটা ভার্জিন মনে করে কাউকে বিয়ে কর, সে যে ভার্জিন আছে তার কোন প্রমাণ আছে কি? বিয়ের পর সে এমন সুযোগ পেলে ব্যবহার করবে কিনা তার নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারবে কি? এসব চিন্তা কর। চল এখন খাওয়া দাওয়া করা যাক। ঠান্ডা মাথায় সব চিন্তা কর।

অনেক চেষ্টা করেও লতিফকে কথায় আনা যায়নি। কিছুদিন পর সব ফেলে দিয়ে সে চলে গেল ক্যালিফোর্নিয়ায়।

কে কখন কোথায় কি ফেলে যায় কেউ জানে না!

-৪৪-

সামার মানে গ্রীষ্মকালটা একটা উৎসব। জুন, জুলাই এবং আগষ্ট এই তিন মাস নগরবাসী উৎসবে মেতে থাকে। পিকনিক মানে বনভোজনের ধুম পড়ে যায়। সব দেশের সব জাতির মানুষ উইকএন্ডে বনভোজনে

চলে যায়। এখানে পার্কের অভাব নেই। যেখানে সেখানে ছোট বড় পার্ক। প্রতিটি পাড়ায় পার্ক। শিশুদের খেলনা প্রায় প্রতিটি পার্কে থাকে। কোথাও পিকনিক স্পট থাকে আলাদা। সেখানে বারবিকউ করার জন্য গ্রীল থাকে। নিজেরা শুধু অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে বারবিকিউ করে নেয়। ভাল স্পট পেতে হলে খুব ভোরে গিয়ে দখলে রাখতে হয়। সারাদিন চলে খেলাধুলা, খাওয়া দাওয়া আর হৈ চৈ। তার সাথে পোষাকের প্রতিযোগিতা। সমস্ত গ্রীষ্মকালটা। মেয়েদের প্রতিযোগিতা হয় কে কত কম পোষাক পরিধান করতে পারে। পিকনিকে প্রতিযোগিতাটা সীমাবদ্ধ থাকে বক্ষ বন্ধনী এবং কোমর ঢাকা পর্যন্ত। এখানে এর বেশি নগ্ন হতে বোধ হয় লজ্জা লাগে। কেউ কেউ শরীরের আরও কিছু অংশ ঢাকতে চেষ্টা করে। আর সি বিচে যারা সমুদ্র স্নানে যায় তারা খোলা মনের। পোষাকের ঝামেলায় তারা যেতে চায় না। মাত্র ছোট্ট দু টুকরো কাপড় দিয়ে গোপনাঙ্গ, (মাফ করবেন, মেয়েদের সমস্ত অঙ্গই গোপন কি না জানি না) মানে নিম্নাংশের গোপন অঙ্গ এবং বক্ষের সামান্য অংশ ঢাকা থাকে। সি বিচে গেলে চোখে ধা ধা লাগে। মনে হয় নগ্ন নারী দেহের একটা প্রতিযোগিতা। একটা ফুলের বাগান। নানা জাতের নানা ফুল। পথে ঘাটেও দেখা যায় হাফ প্যান্ট আর সামান্য বক্ষ বন্দনী পরে তারা এই গ্রীষ্মে আরাম বোধ করছে। গরমটা তারা সহ্য করতে পারেনা। তাই পোষাকের এই স্বল্পতা। প্রতিযোগিতা। কারও ইচ্ছে এই গ্রীষ্মটা চিরস্থায়ী হোক। জীবনটা কেটে যাক এমনি একটা প্রতিযোগিতায় যেখানে পোষাকের কোন বালাই নেই! মেতে থাকবে চিরস্থায়ী আনন্দে।

বাঙালীরাও পিছিয়ে নেই এই উৎসবে। তবে এই ছোট্ট পোষাকে এখও অভ্যস্থ হয়ে উঠেনি কেউ। দুএকজন ছাড়া। তারা নিজেদের বাঙালী বলে পরিচয় দেয় না। মিশে গেছে ভিনদেশীর সাথে।

পিকনিক হচ্ছে যেখানে সেখানে, পারিবারীক ভাবে, দল বেধে বা কোন সংগঠনের মাধ্যমে। বাঙালীরা সংগঠন প্রিয় এবং পিকনিকপ্রিয়ও। বেশিরভাগ পিকনিক হয় সংগঠন থেকে। প্রতিটি সংগঠন বছরে একবার পিকনিক করে। যত বেশি লোক হয় তত বেশি আনন্দ হয়। সারাদিন খাওয়া চলে। তার সাথে খেলাধুলা আর প্রতিযোগিতা। মহিলাদের অনেক আইটেম থাকে মজা করার জন্য। ছেলেমেয়েদের জন্য থাকে অনেক মজার প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতা শেষে পুরষ্কার বিতরনী। অন্তত এই দিনটা উপভোগ করে আনন্দ লাভ করে।

সংগঠনগুলো পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়। পিকনিকের স্থান, তারিখ ইত্যাদি দিয়ে আগে থেকেই মানুষকে দাওয়াত দেয়, ব্যক্তিগত ভাবেও ফোন করে। কোন কোন উইকএন্ডে একই দিনে কয়েকটা সংগঠনের পিকনিক হয়। বিভিন্ন জায়গায়।

এখানকার বাঙালী ছেলেমেয়েরা বাসায় কোন অনুষ্ঠান বা কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যায় না। কিন্তু পিকনিকের কথা শুনলে খুশিতে লাফিয়ে ওঠে। তারা যে কোন পিকনিকে যায় এবং সারাদিন আনন্দ করে।

আনিসের হাতে একটা পত্রিকা। বিজ্ঞাপন দেখছে। এ সপ্তাহে পিকনিক হবে দুটো। একটা বৃহত্তর কুমিল্লা এসোশিয়েশন আর একটা জালালাবাদ এসোশিয়েশন। বাহারের বাসায় ওরা চার জন আলোচনা করছে। কোন্ পিকনিকে যাবে।

বাহার বলল, কুমিল্লার পিকনিকে চল।

আমি তো কুমিল্লার লোক নই। যাব কি করে? আনিস বলল।

তোমার গায়ে লেখা আছে নাকি তুমি কোথাকার? আমি তো সুযোগ পেলে সব গুলোতেই যাই। তুমি কোথাকার সেটা বড় কথা নয়। তুমি গেলে কেউ মনে কিছু করবে না। বরং খুশি হবে। মানুষ যত বেশি হয় পিকনিক তত জমে। বড় কথা হল ছেলেমেয়েরা সারা দিন আনন্দে মেতে থাকে। চল, কুমিল্লার পিকনিকেই যাই।

বিন্দু বলল লতা তো যেতে পারবে না।

কেন যেতে পারবে না?

সৈয়দ সাহেব এসব পছন্দ করেন না। আমার এখানেও তো ঘন ঘন আসা মানা। তারপরও সে আসে।

সৈয়দ সাহেবের পছন্দ দিয়েই কি দুনিয়া চলবে নাকি? 'কেহ যদি না আসে তবে একলা চল রে'। বাহার লতাকে বলল। বলল, দেখ নিজের সংসার ঠিক রেখে জীবনটাকে উপভোগ করতে হবে। সৈয়দ সাহেবকে বুঝাতে হবে। মাঝে মাঝে জীবনে বৈচিত্রের প্রয়োজন। একটু আনন্দের প্রয়োজন। তোমার শান্তর জন্যও মাঝে মাঝে এধরনের অনুষ্ঠানে যেতে হবে। তারও আনন্দের প্রয়োজন আছে।

সৈয়দ সাহেব বলেন এসবকিছুর দরকার নেই। আমি একা বেশি ঘুরাঘুরি তাও তিনি পছন্দ করেন না। তিনি চান শান্তর স্কুল আর বাসা। এর বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। কিছু কেনা কাটার থাকলে তিনি নিযে যাবেন। তবে বাড়ীর পাশে মাঠে যাবার অনুমতি আছে। শুধু শান্তর জন্য। শান্ত যদি খুশি হয়, আনন্দ পায় তাহলে তার কোন আপত্তি নেই।

শুধু কি শান্তর আনন্দ প্রয়োজন? আনিস বলল। শান্তর মা কি চায়? শান্তর মায়ের আনন্দের প্রয়োজন নেই? কোন্ বড় আনন্দের অপেক্ষায় এসব ছোট আনন্দগুলো বাদ দেবেন? ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ পাথর! কিন্তু পায়নি। পরশ পাথর খুঁজতে গিয়ে জীবনের ছোট খাটো আনন্দগুলো বিসর্জন দিয়েছে। জীবনের এই ছোটখাটো আনন্দগুলো কুঁড়িয়ে নিতে হয়। সব বাধা উপেক্ষা করে চলুন। কিছুক্ষণের জন্য হলেও জীবনে একটা বৈচিত্র আনুন।

বিন্দু বলল, তুমি না গেলে কেউ কেউ মনমরা হয়ে থাকবে। চল। সৈয়দ সাহেবকে বলো তুমি আমার সাথে যাবে। শান্ত খুব মজা করবে সারাদিন।

পিকনিকের দিন একটা গাড়ীতে এত মানুষ খুব কষ্ট করে বসতে হল। কোন রকমে গিয়ে পৌঁছল। সারাদিন তারা খুব আনন্দ করে কাটাল। বিন্দু তার এক সহপাঠি পেয়ে গেল। কথা আর শেষ হয় না। তিরিশ বছর পর আচমকা এখানে দেখা। কত কিছু আদান প্রদান হল। তারা ভুলে গেল এখানে পিকনিক হচ্ছে। নিজেদের অতীত কাহিনী রোমন্থন করে কেটে গেল সারা দিন। বিন্দু ভুলে গেল লতা আর আনিসের কথা। লতা আর আনিস খুব খুশি। সারাদিন কেউ মাঝখানে ফোড়ন কাটেনি।

নিউইয়র্কে এই প্রথম লতার দিনটা খুব আনন্দে কাটল।

পরবর্তীতে তারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন করে। কোনদিন সবাই মিলে, কোনদিন শুধু লতা আর আনিস। সবচেয়ে লতার ভাল লেগেছে মিউজিয়াম অব নেচারেল হিষ্টরি। ওখানে নেই পৃথিবীর এমন কোন জিনিষ নেই। বাচ্চারাও খুব উপভোগ করেছে সেখানে। এর দেখার শেষ নেই।

লতা ভাবল জীবন উপভোগ করার কত পথ খোলা আছে এই শহরে! কিছুই দেখলাম না এতদিন!

-৪৫-

আনিসের জন্মদিন হয়। প্রতি বছর। চাচী নিজে থেকে পালন করেন। তার ছেলেমেয়ে নেই। কিন্তু ইচ্ছে হয় বাচ্চাদের জন্মদিন করতে। আনিসকে বলেছে, তুমি আমার বাচ্চা। তোমার জন্মদিন আমি পালন করব প্রতি বছর। এই দিন তোমার অন্য কোন কাজ থাকবেনা। তাছাড়া সেই শুরু থেকেই আনিসের সাথে চাচীর একটা চুক্তি আছে। প্রতি সপ্তাহে ফোন করা, মাসে অন্তত দুএকদিন বাসায় যাওয়া, চাচীর সাথে যখন ইচ্ছে দেখা করা। তার বাইরে এই জন্মদিন। জন্মদিন করতে চাচী আনন্দ পান। প্রতি বছর শুধু চাচীর দুএকজন বন্ধু এবং আনিসকে নিয়ে ডিনার করে। আর আনিসকে আলাদা টাকা দেন তার ইচ্ছেমত বন্ধুদের নিয়ে আনন্দ করার জন্য। সে টাকাটা আনিস খরচ করার জায়গা পায় না।

এ বছর তিনি ঠিক করেছেন সবাইকে নিয়ে এক সাথে জন্মদিন পালিত হবে। আনিসের বন্ধু, চাচা চাচীর বন্ধু, সব এক সাথে। যার যার পছন্দের লিষ্ট করতে বলেছেন। স্থান ঠিক করেছেন মোগল রেষ্টুরেন্ট।

চাচীর বন্ধু চার জন। চাচার আছে ছয়/সাত জন। তার মাঝে সৈয়দ সাহেবও আছেন। আর আছেন করিম, আলম আর কারী সাহেব। সৈয়দ সাহেবকে দাওয়াত করবে কিনা তা আনিসকে জিজ্ঞেস করে নিয়েছেন চাচা। বাকী সব আনিসের। আনিস ছোটখাটো একটা লিষ্ট করেছে। সে লিষ্টে পরিচিত প্রায় সকলের নাম আছে। লতার নাম এবং পিঙ্কির নামও।

পার্টি শুরু। একে একে অতিথি আসছেন। চাচা চাচী এবং আনিস প্রবেশ পথের কাছে দাঁড়িয়ে স্বাগতম জানাচ্ছেন। আজকে আনিস পড়েছে সুন্দর একটা সুট। লতার কিনে দেয়া একটা সুট এই প্রথম পড়েছে। মানিয়েছে খুব।

এক সময় লতা এল শান্তর হাত ধরে। সৈয়দ সাহেব নেই। চাচা এগিয়ে গেলেন। এস, এস। খুব খুশি হয়েছি। সৈয়দ কৈ?

তিনি তো আসতে পারলেন না। সিটির একটা বড় কন্ট্রাক্টের ব্যাপারে এক বড় সাহেবের সাথে এপয়েন্টমেন্ট আছে। যদি নয়টার মধ্যে শেষ করতে পারে তাহলে আসবে। আপনাকে বলতে বলেছে।

ঠিক আছে। জরুরী কাজ থাকলে কি আর করা! যাও, আনিস ওদেরকে বসিয়ে দাও।

আনিস নিয়ে গেল একবারে প্রথম সারিতে। যেতে যেতে লতা বার বার আনিসের পোষাকের দিকে তাকাচ্ছে। যা মানিয়েছে ওকে! লতা চোখ ফেরাতে পারছে না। মনে মনে খুব খুশি হয়েছে।

এটা বিরাট হলঘর। বিয়ের অনুষ্ঠান, বা জন্মদিন অথবা বিবাহবার্ষিকী এ জাতীয় অনুষ্ঠান হয় এইসব পার্টি-হলে। ইন্ডিয়ান অনেক রেষ্টুরেন্ট আছে এসব পার্টির জন্য খুব পরিচিত। যে যেমন খাবারের ম্যান্যু চায় সেভাবেই পরিবেশন করে। এখানে শত পাঁচেক মানুষ বসার ব্যবস্থা আছে। সুন্দর ছিমছাম পরিবেশ। হিন্দি গান বাজছে। এমন একটা পার্টি-হলে লতা এই প্রথম। তার খুব ভাল লাগছে। একটা টেবিলে বসিয়ে দিয়ে আনিস বলল, বসুন, আমি আসছি।

এখান থেকে পুরা হলঘরটা দেখা যায়। একে একে অতিথি আসছে। চাচীর মেহমান আসতেই তিনি নিয়ে গেলেন অন্য পাশে। আগে থেকেই পরামর্শ করা আছে। কার মেহমান কোন্‌দিকে বসবে। চাচীর মেহমান বসবে ডানদিকে। চাচীর সহকর্মি। কাছাকাছি এক সাথে বসবে।

সেখানে পানীয় চলবে। যারা পান করেন তাদের জন্য এ ব্যবস্থা করা আছে। বাঙালীরা কেউ কেউ পান করে না। বা লুকিয়ে পান করে থাকে। চাচীর মেহমানরা জানে শরাব ডিনারের একটা অংশ। না হয় ডিনার অপূর্ণ থাকে। চাচার মেহমান বসবে বাম দিকে। মাঝখানে সমস্ত হলঘর আনিসের মেহমানের জন্য।

চাচীর অতিথি কেউ কেউ পান করে বিভোর হবেন, পান করতে করতে কেউ স্বর্গে চলে যাবেন। হুরের কাছাকাছি। যদি সাথে মহিলা থাকে সেই হয়ে যাবে তখন স্বর্গের হুর। চাচী এসব জানেন। তখন তাদেরকে সামলে রাখতে হবে। চাচী নিজেও পান করেন। ইদানিংকালে কদাচিত। তবে মাত্রা ছাড়িয়ে যান না কখনও। তাই চাচী থাকবেন সেখানে তদারকি করতে। কিন্তু সমস্যা চাচাকে নিয়ে। চাচা মাঝে মাঝে বেহুস হয়ে যান। তাল ঠিক রাখতে পারেন না। এ অভ্যেস বহুদিনের। তিনি যখন জাহাজে কাজ করতেন তখন থেকেই। বহু চেষ্টা করেও ছাড়তে পারেননি। তিনি রাখঢাক করেন না। খোলাখুলিভাবেই পান করেন। অনেকেই জানে। আবার নামাজ রোজাও করেন। তিনি বলেন, পাপ-পূণ্যের একটা অংক আছে। যোগ বিয়োগ করে কিছু পূণ্য অবশিষ্ট থাকলেই হল। পূণ্য অবশিষ্ট থাকলে বেহেস্ত লাভ হবে। সেখানে তো সব ফ্রি। আজকে অবশ্য তিনি চাচীকে কথা দিয়েছেন মাত্রা ছাড়িয়ে যাবেন না। তারপরও চাচী সব সময় নজর রাখবেন।

অতিথি আসছে। প্রায় সকলের হাতেই একটা না একটা উপহার। আনিসের সাথে হাত মিলাচ্ছে, কেউ কোলাকুলি করছে। তারপর যার যার আসন গ্রহন করছে। বাহার এল শুধু বিন্দুকে নিয়ে। ছেলেমেয়ে সাথে নেই। ওরা বাঙালী পার্টিতে গিয়ে নাকি মজা পায় না। এদেশে বড় হচ্ছে এমন সব বাঙালী ছেলেমেয়েরা যেন একই শিক্ষায় শিক্ষিত। কি করে যে তারা একই ধরনের আচরণ করে তা বুঝা মুস্কিল। আনিস এগিয়ে গেল। চাচা চাচীর সাথে আগে থেকেই পরিচয় আছে। কুশল বিনিময় করে বিন্দু পার্টিহলটা একবার চোখ বুলিয়ে নিল। লতা যে টেবিলে বসা সে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। বিন্দুকে দেখেই খুশিতে লতার চোখগুলো নেচে উঠল। আসুন আপা, এখানে আসুন। এতক্ষন লতার কোন সঙ্গি ছিলনা। বিন্দুও খুঁজছিল এমন একজন যার সাথে মন খুলে কথা বলা যায়। লতা বলে কম, শুনে বেশি। তাতে বিন্দুর মুরুব্বিয়ানা বেশ বজায় থাকে। ইদানিংকালে বিন্দুর সবচেয়ে প্রিয় মহিলা লতা। লতার অবারিত দ্বার বিন্দুর ঘরে। সব বই পড়া শেষ হয়ে গেছে। এখন বিন্দুর চেয়ে বেশি বই লতার ঘরে। লতা রাস্তা চিনে গেছে। যত রকম গানের কেসেট কিনে সব বিন্দুকে দেয় শুনতে। অনেক গুলো কেসেট বিন্দুকে উপহার হিসেবে দিয়েছে। লতার ঘরে এখন কেসেটের একটা দোকান বলা যায়। এক টেবিলে বসে মনে হল একজন আর এক জনের কত আপন! এবার দুজনের মুখ খুলে গেল। এসব পার্টিতে এই গল্পই মজা। খবর আদান প্রদান এবং এই পার্টি নিয়ে আলোচনা করা অথবা কোন ব্যক্তিকে নিয়ে তার দফা রফা করা। বসতেই লতা বলল, এবার আপনার জন্য দু'টা কেসেট এনেছি। লতা এখন একাই চলে যায় জ্যাকশন হাইটসে। ইচ্ছেমত ঘুরে ঘুরে জিনিষ কিনে। আনিস সাথে না গেলেও চলে।

বিন্দু জিজ্ঞেস করল কার গানের?

কয়েক জনের গান। সেটা হল অতুল প্রসাদের গান। নিশ্চয়ই আপনার ভাল লাগবে।

ঠিক এই সময় একজন মহিলা অতিথি ঢুকল হাতে একটা ফুলের তোড়া নিয়ে। লতা দরজার দিকে মুখ করেই বসেছে। অতিথি যারা আসছেন সব দেখা যায়। মহিলা আনিসের হাতে ফুলের তোড়াটা দিয়েই তাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেয়ে বলল, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ!

গত দু বছর প্রায় প্রতিদিন কলেজের পর পিঙ্কি আর আনিস দেখা করেছে, গল্প করেছে, মাঝে মাঝে সিনেমা দেখেছে। একজনের ক্লাশ আগে শেষ হয়ে গেলে আর একজন অপেক্ষা করে। গল্প করতে করতে দু'একদিন পার্কে গেছে। যখন যেখানে যেতে বলেছে আনিস বিনবাক্যে পিঙ্কির সঙ্গ দিয়েছে। ইদানিংকালে পিঙ্কি তার অন্যান্য বয়ফ্রেন্ডদের সাথে খুব একটা মিশে না। দেখা হলে হাই, হেলো বলেই কথা হয়। এখন আর কারও সাথে কোলাকুলি করতে দেখা যায় না। যখনই সময় পায় আনিসের সাথে সময় কাটায়। যখন তখন জড়িয়ে ধরে। চুমো খায়। আনিস তখন নিথর হয়ে যায়। তার মন চলে যায় লতার কাছে। সে দেখতে পায় লতা তাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খাচ্ছে। আনমনা হয়ে ভাবতে থাকে। সহসা মুখ দিয়ে কথা বের হয় না। মাঝে মাঝে চোখ বন্ধ করে লতাকে দেখে। কয়েক মুহূর্তের জন্য হারিয়ে যায় লতার কাছে। যখনই চোখ খোলে, দেখতে পায় পিঙ্কি সামনে। ফিরে আসে বাস্তবে। তার এই অবচেতন মুহূর্তে পিঙ্কি এগিয়ে যায়। কবে যে প্রথম চুমো শুরু করেছিল পিঙ্কি তা আনিস মনে করতে পারে না। একদিন পিঙ্কি আনিসকে বলল, আমিই তোমাকে চুমো দিয়ে যাচ্ছি, তুমি তো কোন দিন আমাকে নিজে থেকে দাওনি। আনিস বলেছিল, আমি অভ্যস্থ নই। যতক্ষন পিঙ্কির সাথে সময় কাটে ততক্ষন আনিস দেখতে পায় লতাকে। পিঙ্কির সাথে লতার তুলনা করে। তার মনে হয় লতার সাথে পিঙ্কির কোন তুলনা হয় না। একজন দূরের নক্ষত্র, নাগালের বাইরে, আর এক জন হাতের কাছে। হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়। যা সহজে মেলে তার দাম অনেক কম।

লতার চোখ চড়কগাছ! কে এই মহিলা! এত মানুষের সামনে আনিসকে চুমো দিয়ে ফেলল! বব কাটিং চুল, পড়নে একটা জিন্সের পেন্ট। মনে হয় কোমরের নীচের অংশ যে কোন সময় ফেটে বেরিয়ে পড়বে সুডৌল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ! গায়ে একটা ফিন ফিনে পাতলা হাফ হাতা সার্ট। গায়ের সাথে এমন ভাবে ফিট করা আছে যা একটু এদিক সেদিক হলেই ফেটে যেতে পারে! বিন্দু কি যেন বলছিল। উত্তর না পেয়ে লতার দিকে তাকাতেই দেখে লতা এক দৃষ্টিতে দরজার দিকে তাকিয়ে আছে। বিন্দুও দেখল চুমোর শেষ দৃশ্যটা।

আনিস চাচা চাচীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। পিঙ্কি, আমার কলেজের বন্ধু।

চাচা চাচী 'হাই' বলে মুখ চাওয়া চাওয়ি করলেন।

তারপর মহিলা হাসতে হাসতে হলের দিকে এগিয়ে এল। আনিস লতাদের পাশেই একটা টেবিলে বসিয়ে দিয়ে বলল, এই হল আমার কলেজের পিঙ্কি। আর উনারা দুজন আমার ভাবী বলে সে চলে গেল।

বিন্দু পিঙ্কিকে জিজ্ঞেস করল, আপনি একাই এসেছেন?

হ্যা, আমার সাথে কেউ আসেনি।

আনিসের সাথে এক ক্লাশেই পড়েন?

না, আমার অন্য সাবজেক্ট। আমি ওর থেকে এক বছর সিনিওর।

লতা আর একবার আড়চোখে তাকিয়ে দেখল। একটা কথাও বলল না। বিন্দু লতার চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখল একটা বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট। এমনিতেই লতা কম কথা বলে, রাগ হলে একদম চুপ করে যায়।

বিন্দু বুঝতে পারল পিঙ্কির চুমো লতার মেজাজ খারাপ করেছে। কিন্তু কেন! আনিস এখন গনিমতের মাল। যে কোন একজন নিতে পারে। যে কোন মেয়ের সাথে ভাব হতে পারে। সে এখন মুক্ত বিহঙ্গ। ধরা পড়েনি এখনও। পিঙ্কিকে দেখে মনে হয় অবিবাহিতা। লতা বিবাহিতা। পিঙ্কি যদি আনিসকে চুমো দেয় তাহলে লতার বিমর্ষ হবার কারন কি! বিন্দু আগের আলোচনায় ফিরে গেল। কিন্তু মনে হল ছন্দপতন! লতার মুখের খুশির ছাপ হারিয়ে গেছে। এখন একটা বিরক্তির ছাপ। কিছুক্ষণের মধ্যেই অতিথি এসে আশেপাশের টেবিলগুলো ভরে গেল। পারুল ভাবী আসতেই বাতাসটা হালকা হয়ে গেল। তার সাথে যোগ দিল করুনা। কথা লাফালাফি করছে। সকলের মুখে। কারটা কে শুনছে বুঝা যাচ্ছে না। প্রশ্ন, প্রশ্নের উত্তর চলছে। ধারাবাহিকভাবে। এক সময় খাওয়া শুরু হল। যার যার খাবার নিয়ে আসতে হবে। লাইন ধরে।

বাহারের কথা ছিল এই টেবিলে বসার। মহিলারা দখল করে নিয়েছে বলে সে বসেছে জাহাঙ্গির আর নিখিলের সাথে। মহিলারা আগে লাইনে যাবে। লেডিস ফার্ষ্ট। সবাই লাইনে গেল। লতা বসে রইল। বিন্দু জিজ্ঞেস করল, কি হল! বসে আছ কেন? চল খাবার নিয়ে আসি।

আমার খেতে ইচ্ছে করছে না। আপনারা যান, নিয়ে আসুন।

তার মনের অবস্থা একটু আচ করতে পেরেছে বিন্দু। সে দু প্লেট খাবার নিয়ে এল। বলল, নাও, শুরু কর।

আমার খেতে ইচ্ছে করছে না।

যা পার খাও। আমি নিয়ে এসেছি, অন্তত আমাকে খুশি করার জন্য কিছু খাও।

অনিচ্ছায় লতা সামান্য কিছু মুখে দিল। এখন সবাই খাওয়ায় ব্যস্ত। মুখ চলছে, খাওয়া এবং কথা। শুধু লতা চুপ করে আছে। মনে হয় কারও কথা কানে যাচ্ছে না।

রাত সাড়ে নয়টার দিকে খাওয়া শেষ হল। অনেকেই ঘরে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছে। নিখিলের কাল সকালে কাজ আছে। চলে গেছে। দশটার দিকে বিন্দু যখন উঠবে উঠবে করছে এমন সময় চাচার সাথে একজন মৌলানা এল তাদের টেবিলে। মৌলানা চাচাকে বলছে, আমার নিজের পার্টি ছিল। খেয়ে এসেছি। এখন আর খাওয়া যাবে না। লতাকে বলল, চল যাই। কাল সকালে শান্তর স্কুল আছে।

ওরা চলে গেল। লতার চলে যাওয়াটা স্বাভাবিক মনে হলনা বিন্দুর। কে লোকটা তার কোন পরিচয় পেল না। বাহারের টেবিলের দিকে তাকিয়ে বাহারকে ডাকল। বাহার এলে জিজ্ঞেস করল, লতা কার সাথে গেল?

ওর স্বামীর সাথে গেল।

ওই দাঁড়িওয়ালাটা ওর স্বামী? একটা বুড়া লোক! অনেক বয়স!

অন্যের ব্যাপারে এসব চিন্তা করে কোন লাভ আছে? আমার বয়স নিয়ে হিসেব কর। বলে বাহার ফিরে গেল তার টেবিলে।

বিন্দুর মাথায় চিন্তা ঢুকেছে। মানুষ কোন কোন সময় মনের অজান্তেই একটা পক্ষে চলে যায়। কখন কেন যায় সে নিজেই জানে না। কোন মাঠে দু দেশের দুপক্ষ যখন বল খেলে, যাদের সাথে কোন যোগাযোগ বা সম্পর্ক নেই, সেখানে খেলা দেখতে দেখতে এক সময় মনের অজান্তেই একটা দলকে সমর্থন করা চলে আসে। কখন কেন আসে দর্শক জানতেই পারে না। বিন্দুর অবস্থাটাও তাই হয়েছে। সেই দাঁড়িওয়ালা লোকটাকে নিয়ে ভাবছে। পিঙ্কির চুমো, লতার ব্যবহার, তার চোখ মুখের পরিবর্তন, হঠাৎ করে চুপ হয়ে যাওয়া এই সবকিছু নিয়ে ভাবছে

এবং নিজের অজান্তেই তার মন চলে গেছে লতার পক্ষে, কিভাবে লতাকে খুশি করা যায়। বিন্দু পারবে বলেও মনে হয়। তার কিছু কর্মের সামান্য ধারনা দিলেই পাঠক অনুমান করতে পারবেন।

বিয়ের আগে দেখা গিয়েছিল বিন্দুর চোখে উদাস নির্লিপ্ত আকাশ। পৃথিবীর ছোটখাটো ঘটনা তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। স্বল্পভাষী, একেবারে উদাসী বিন্দু।

বিয়ের কয়েকমাস পরেই বাহারের ক্রেডিট রেকর্ড নিয়ে রিপোর্ট তৈরি করে পেশ করে ফেলল। কোন কিছু বাদ যায়নি। কবে কোথায় কার সাথে দেখা হয়েছিল, কি কথা হয়েছিল, কত সময় ব্যয় হয়েছিল, দাড়ি কমা কিছুই বাদ যায়নি। এমন সরল সোজা একটা মেয়ে হঠাৎ যেন পুলিশ হয়ে গেল। বাহার বলল, তোমাকে এই পুলিশের চাকরিটা কে দিল?

এসব চাকরি নিয়ে নিতে হয়, কেউ দেয় না। সেই থেকে সে বাহারের সাথে আছে একটা পুলিশ হিসেবে। আসলেও সে যে পুলিশ সম্প্রদায়ের তা বাহার খেয়াল করেনি। কিন্তু তার নিজের বেলায় কোন রেকর্ড নেই। একদম পরিষ্কার। ভুলেও মুখ ফসকে একটা শব্দও বের হয়নি। কোন রেকর্ড নেই। বিন্দু নিজেই পুলিশের কাজ করে বেড়ায়। এই কাজটা করতে করতে এখন সে পুলিশের আইজির সমপর্যায়ে আছে। এফবিআই অথবা কেজিবির সাথে কাজ করার যোগ্যতা রাখে। বিন্দু মেয়েদের রোগ নির্নয়েও যথেষ্ট পরিমানে পারদর্শি। এখন লতাকে নিয়ে সে ভাবছে। কি রোগ, কি তার চিকিৎসা, কিভাবে তাকে সুস্থ বা খুশি করা যায় ইত্যাদি। এসব ভাবতে ভাবতেই পার্টি শেষ হল।

-৪৬-

পার্টি শেষ হয়েছে আজ দু সপ্তাহ। আনিস পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত। আড্ডা অনেক কমিয়ে দিয়েছে। উইক এন্ডে বাহারের বাসায় অথবা লতাকে নিয়ে নিজের ঘরে অথবা বাজারে যায়। আজ দু সপ্তাহ লতার সাথে যোগাযোগ নেই। না ফোন করে না বাসায় আসে। আনিস অনেকবার ফোন করেছে। কেউ উঠায় না। শেষ পর্যন্ত শুক্রবার সন্ধ্যায় লতার বাসায় গেছে। বাসায় নেই।

বিন্দুর সাথে পরিচয় হবার পর থেকে আনিসের বাসায় আসা অনেক কমে গেছে লতার। তারপরও সপ্তাহে একদিন তো আসেই। মাঝে মাঝে বিন্দুর বাসায় দেখা হয়। কেনা কাটাও অনেক কমে গেছে। আনিসকে না পেলে লতা একাই যায় বাজারে। লতা যখন তখন যায় বিন্দুর কাছে।

পার্টি থেকে ফিরে লতা বিন্দুর বাসায়ও আসেনি, কলও দেয়নি। বিন্দু কয়েকবার কল করেছে। গানের কেসেট এনেছে, তাও দেবার নাম নেই।

বিন্দুও কয়েকদিন কল করেছে। কেউ ধরেনা ফোন। লতা নিজে থেকেও কল করে না। কি হয়েছে লতার! এমন নিখোজ হয়ে গেল কেন! বিন্দু লতার রোগের কথা নিয়ে ভাবছে। সেই পার্টিতেই লতার মন খারাপ হয়ে গেছে। বিন্দু অঙ্ক করছে। যোগ বিয়োগ করে মিলাতে চেষ্টা করছে। যখনই মনে হয় একটা দাড়িওয়ালা লতার স্বামী তখনই তার মনটা খারাপ হয়ে যায়। দাড়িওয়ালা মানুষ বিন্দু একদম দেখতে পারে না। তার ধারনা দাঁড়ি মানে বদমাইশি করার একটা সাইনবোর্ড। কি জানি বিন্দু কোনদিন কোন দাড়িওয়ালার খপ্পরে পড়েছিল কিনা! মানুষের

জীবনে তো কত কিছুই গোপন থাকে। লতাকে নিয়ে তার ভাবনার শেষ হয় না।

রাতে বিছানায় শুয়ে বাহারকে বলল, এখানে তো মেয়েরা স্বাধীন। নারী স্বাধীনতার চুড়ান্ত সুযোগ উপভোগ করছে নারীরা। বিশেষ করে আমাদের দেশের নারীরা। যা এদেশের মেয়েরাও করেনা। যাকে যার পছন্দ হচ্ছে তার সাথে চলে যাচ্ছে। আর তা হচ্ছে নিজেদের পরিচিত মহলেই। স্বামীরা এখানে নিরুপায় - অসহায়। আমরা নারীরা এখানে অনেক কিছু করতে পারি তা জান তো!

মাথাটা বিগড়ে গেল নাকি! হঠাৎ এসব অদ্ভুদ সঙ্কেত কেন? কোথায়ও লাইন পাওয়া গেছে নাকি?

লাইন না ঠিক ধরতে পারছি না। তুমি তো লতার বাসা চিন। কাল একবার নিয়ে যেতে পারবে?

হঠাৎ লতার বাসায় কেন?

কয়েকদিন যাবত ওর কোন খবর পাইনা। ফোন করলেও কেউ উঠায় না। কোন অসুখ হল কিনা একটু খবর নেয়া দরকার।

আর যেতে হলনা। পরের দিন সকালেই লতা ফোন করল। বিন্দু একবারে অনেকগুলো প্রশ্ন করে বসল। কি হয়েছে তোমার? বাসায় ছিলেনা নাকি এ কয় দিন? কোন বিপদ হয়নি তো?

না, বিপদ হয়নি। শরীরটা ভাল যাচ্ছে না।

তুমি না বললে আমার জন্য নতুন কেসেট কিনেছ? এখনই চলে আস। দুপুরে এক সাথে খাব আর গান শুনব। এখনি চলে আস।

ঘন্টা দুয়েক পরেই লতা এল। বিন্দু চা করে টেবিলে নিয়ে বসল। সেদিনের পার্টির কথা শুরু করল। কেমন হল, কে কি কি কথা বলল। তারপর আনিসের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ তুলল। এসব বলার সময় লতার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে লক্ষ করছে তাকে। মনে হল আনিস খারাপ হোক ভাল হোক তাতে লতার কিছু আসে যায় না। আনিস সম্মন্ধে লতা অনেকটা যেন উদাসীন। তারপর আবার শুরু করল আনিসের গুনগান করা। অনেকক্ষন পরও যখন কোন মন্তব্য করেনি লতা তখন অন্য দিকে কথার মোড় ঘুরে গেল। গান নিয়ে শুরু হল আলোচনা। এবার মাঝে মাঝে লতার মুখ খুলল। অনেকটা সহজ হল। স্কুল ছুটি হবার আগেই আবার চলে গেল।

পরের শনিবারে আনিস এল। এক ফাঁকে বিন্দু আনিসকে ডেকে নিয়ে গেল রান্না ঘরে। একটা চেয়ার দিয়ে বলল, বস।

আনিস বসতেই বলল, সেদিন তোমার বান্ধবীকে দেখে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। মেয়েটা দেখতে খুবই সুন্দরী। তোমারও নিশ্চয়ই পছন্দ?

এই সেরেছে! আমি জানি সেদিনের ঘটনা মুখরোচক গল্প হয়ে গেছে। আমি নিজেও লজ্জিত। পিঙ্কির সাথে আমার সে রকম সম্পর্ক নেই। তবে তার সাথে বিশেষ একটা সম্পর্ক আছে। সেটা হল শুধুই বন্ধুত্ব। এর বেশি কিছু নয়। কলেজের শুরুতে সে আমাকে সঙ্গ দিয়েছে। আমি কাউকে চিনতাম না। পিঙ্কি না থাকলে মানুষের সাথে অন্তত কিছুদিন আলাপও হত না। প্রথম দিনই পিঙ্কি অনেকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে কলেজের প্রথম দিনটা একটা স্মরনীয় দিন করে দিয়েছে। সে খুব খোলা মনের মেয়ে।

আমি তো খারাপ কিছু বলছি না। এদেশে এমন বন্ধুত্ব হয়েই থাকে। বন্ধুত্ব থেকেই জীবন সাথী হয়ে যায়। আমরা সে রকম কিছু ভাবতে পারি কিনা। দেখে তো মনে হল তোমার উপযুক্ত সাথী।

ভাবী, আপনি মনে করবেন না পিঙ্কি শুধু আমাকেই চুমো দিয়েছে। প্রথম যেদিন কলেজে যাই সেদিন পিঙ্কি কয়েক জন ছেলের সাথে কোলাকোলি করেছে, দুএকজনকে চুমো দিয়েছে। এ দৃশ্য দেখে আমি নিজেই লজ্জা পেয়েছিলাম। পরে দেখলাম এটা এমন কিছুই না তার কাছে। এ রকম অনেকের সাথে তার বন্ধুত্ব। ইদানিং এই কোলাকুলিটা কমেছে। ওর সাথে আমার শুধুই বন্ধুত্ব। এর বেশি আমি কোন চিন্তা কোনদিনই করিনি বা করি না। এ ব্যাপারে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। এবার আমি এই ইন্টারোগেশন সেল থেকে ফেরত যেতে পারি?

ইন্টারোগেশন বলছ কেন, বল অবস্থার পর্যালোচনা। যার উপর নির্ভর করে মানুষ কর্মে এগিয়ে যেতে পারে।

আর এগোবেন না। যথেষ্ট হয়েছে। যতই চেষ্টা করুন না কেন এখানে কিছুই খুঁজে পাবেন না। শুধুই বন্ধুত্ব, আর কিছু নয়। আমি বুঝতে পেরেছি এ নিয়ে অনেকেই অনেক কিছু ভাবছে। লতা ভাবীও যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছে।

তাই নাকি? হয়ত কোন কাজে ব্যস্ত, তাই যোগাযোগ করতে পারছে না।

কি এমন কাজ যে বাসায় গিয়েও পাওয়া যায় না?

তাহলে বাসায়ও গিয়েছিলে লতার খোঁজে? লতার জন্য এত চিন্তা কেন?

শুধু লতার জন্য নয়, আপনার জন্যও আমার অনেক চিন্তা আছে। কয়দিন নিখোঁজ হয়ে দেখুন না। আমি আপনাকে কিভাবে খুঁজে বেড়াই! বলে আনিস চলে গেল চায়ের টেবিলে। যেন পালিয়ে বাচঁল!

লতার সাথে কোন রকমেই যোগাযোগ করতে পারছে না আনিস। দু সপ্তাহ পর একদিন বাহারের বাসায় দেখা। আনিসের প্রশ্নের জবাবে মন মরা ভাবে উত্তর দিয়েছে। মনে হয় আনিসকে খুব একটা চিনে না। সব সময় বিন্দুর কাছাকাছি থাকে। আনিস প্রশ্ন করলে বিন্দুর দিকে তাকিয়ে উত্তর দেয়। ব্যস্ত হয়ে পড়ে বিন্দুর সাথে। কাজে সাহায্য করে। আনিস অনেক চেষ্টা করেও আগের মত কথা বলতে পারল না। লতা যেন দূরের কোন অচেনা মানুষ।

আনিস ভাবছে নিশ্চয়ই চুমোর খেসারত। দিতে হবে। কতদিন চলবে কে জানে!

বিন্দু সবকিছুই খেয়াল করছে। ভাব দেখাচ্ছে যেন সে রান্নার কাজে খুব ব্যস্ত। আসলে পুলিশের মন কোথায় কি খুঁজে বেড়ায় কে জানে! পুলিশ নিজেও কি জানে?

-৪৭-

আজ ২০শে ফেব্রুয়ারি। বিকেলে বাংলাদেশ ফুটবল লীগের একটা মিটিং আছে। মে-জুন থেকেই খেলা শুরু হবে। আগে থেকে খেলার কমিটি এবং কার্যপ্রনালী প্রস্তুত করতে হবে। ফুটবল খেলা। বাঙালীর আজন্ম পরিচিত প্রিয় খেলা ফুটবল। প্রবাসে এই ফুটবল হয়ে গেছে সক্কার। তাই বলে বাঙালী পিছিয়ে নেই। যে যাই বলুক, বাঙালী এই খেলাকে ফুটবলই বলবে। যারা খেলোয়ার তারা সবখানেই খেলে - না হয় তাদের পেটের ভাত হজম হয়না। অবশ্য সামনে বিপদ থাকলে তো ফুটবলে লাথি মারা যায় না। তাই প্রবাসে এসেই জীবিকার ধান্দায় ব্যস্ত হয়ে পড়তে হয়। কোন রকমে একটু দাঁড়াতে পারলেই মাথায় খেলার

কিড়াগুলো ক্রীড়া হয়ে কিলবিল করতে থাকে। একটা কিছু করা চাই। চেষ্টা করলেই যোগাড় হয়ে যায়। প্রবাসীরা বসে নেই। কয়েকজন ক্রীড়াবিদ একত্রিত হয়ে তাদের সখ মেটাবার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। নিউইয়র্কে প্রথম বাঙালির ফুটবল সংগঠন 'জালালাবাদ ফুটবল টুর্নামেন্ট' নামে আত্মপ্রকাশ করে ১৯৮৮ সালে। দেওয়ান আকমল চৌধুরী সভাপতি, সাব্বির আহামদ সাধারন সম্পাদক ও হেলাল আহমদ রেফারী নিযুক্ত হন। প্রথম বছর লীগে ছয়টি দল অংশ গ্রহন করে। নিউইয়র্কের ইস্ট রিভার মাঠে খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই লীগে বাংলাদেশীদের মাঝে বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়। ফলে কর্মকর্তাগন অনুপ্রানিত হয়ে 'বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন অব আমেরিকা' নামে ১৯৮৯ সালে একটি ক্রীড়া সংগঠন গঠন করেন। লীগের নাম দেন 'বাংলাদেশ ফুটবল লীগ'। সেই থেকে প্রতি বছর লীগের খেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই সব ক্রীড়া সংগঠনের সাথে জড়িত আছেন দেশের অনেক নামি দামী ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়াসংগঠক। এসব সংগঠনকে সংগঠিত করার কাজে তাদের দান অপরিসীম।

এই লীগে যেসব ক্রীড়া সংগঠন অংশ গ্রহন করে তা হল: মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, আবাহনী ক্রীড়াচক্র, আবাহনী ক্রীড়াচক্র (জুনিয়র), বাংলা একাদশ, বিয়ানী বাজার ফুটবল একাদশ (লাল), বিয়ানী বাজার ফুটবল একাদশ (সবুজ), বেউল ব্রাদার্স অব নিউজার্সি, ওসমানী স্পোর্টিং ক্লাব অব নিউজার্সি, সানরাইজ, ব্রাদার্স ইউনিয়ন, চলন্তিকা ক্রীড়াচক্র, নারায়নগঞ্জ একাদশ, ঢাকা ক্লাব অব নিউইয়র্ক, চাটখিল একাদশ।

বাহার আনিসকে বলল, চল আনিস,মিটিং সেরে জেকসন হাইটসে ইন্ডিয়ান রেষ্টুরেন্টে আজ রাতে খাব, আড্ডা দিয়ে রাতে শহীদ মিনারে যাব। বাংলা ভাষা আন্দোলনে শহীদদের শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করব।

শহীদ মিনার? এখানে শহীদ মিনার আছে নাকি?

হ্যা, এখানে শহীদ মিনার আছে। ঠিক বাংলাদেশে যেমন হয় তেমনি এখানেও উদযাপন হয়। শুরু হয়েছে ১৯৯২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারী থেকে। এর উদ্দোক্তা মুক্তধারার মালিক বিশ্বজিত সাহা। বিশ্বজিত তার নিজের চেষ্টায় এবং খরচে জাতিসঙ্ঘের সামনে প্রতি বছর শহীদ মিনার তৈরি করে। ২১শে ফেব্রুয়ারীর ঠিক ১২টা এক মিনিটে উদ্বোধন করা হয়। মজার হল উপস্থিত সর্বকনিষ্ট শিশুটি উদ্বোধন করবে। তারপর প্রধান অতিথি, বিভিন্ন সংগঠন এবং ব্যক্তিগতভাবে পুস্প অর্পন করবে শহীদ মিনারের বেদীতলে। বিশ্বজিতের এই উদ্দোগ খুবই প্রশংসার দাবী রাখে। বিশ্বজিত আরও কিছু ব্যবসা করছে যা শুধুই ব্যবসা নয়, বাঙালির চেতনা এবং সংস্কৃতিকে ধরে রাখার আপ্রান চেষ্টাও বলা যায়। এখানে প্রথম বইএর দোকান শুরু করে বিশ্বজিত। এখানে একটা ছোট্ট কাহিনী আছে। ১৯৯১ সালে কুইন্সে একটা রবীন্দ্র মেলা হয়। পশ্চিম বঙ্গের বাঙালী দ্বারা। সেখানে বিশ্বজিত গিয়েছিল দেখতে। কিছু বইর দোকান ছিল পশ্চিম বাংলার। সে সব দোকানে বাংলাদেশের কোন লেখকের বই নেই। এই দেখে বিশ্বজিতের মনে দাগ কাটে। সে তখন বাংলাদেশে যোগাযোগ করে মুক্তধারার সাথে। এক সপ্তাহের মধ্যেই ৩০০ বই আনে। তার কিছুদিন পরই বাংলাদেশ সম্মেলন। সেই সম্মেলনে তার সব বই বিক্রি হয়ে যায়। তারপর ৫০০ তারপর আরও আনতে লাগল। বই প্রেমিকদের খোরাক সে যোগাতে লাগল। তখন এখানে কোন বাংলা নাটক বা সিনেমা পাওয়া যেত না। সবই ছিল হিন্দি ছবি। বিশ্বজিত ভাবল, এখানে কেন বাংলা নাটক আর ছবি আনি না?

সেই থেকে শুরু হল বাংলা বই, নাটক, ছবি ইত্যাদি আমদানি। তার সাথে সিডি, ডিভিডি, অডিও, ভিডিও কেসেট। প্রায় সব বাঙালি দোকানে এসব পাওয়া যায়। হাতের কাছে সহজলভ্য করে দিয়েছে। ঘরে ঘরে এখন বাংলা ছবি চলে। অবশ্য এখন নতুন আরও কিছু বইর দোকান হয়েছে। যেমন শহীদের বইঘর, মোহন গোমেজের বইর দোকান।

রাত এগারটায় ওরা যখন জাতিসঙ্ঘের সামনে পৌঁছল তখন সেখানে হাজার খানেক মানুষ অপেক্ষা করছে। প্রচন্ড হাড়কাঁপানো শীতে অনেকেই এসেছে ছেলে মেয়ে পরিবার সহ। রাস্তার উপর শহীদ মিনার দেখেই আনিসের মনের পরিবর্তন হয়ে গেল মুহূর্তে। সে চলে গেল ঢাকায়। ঠিক ঢাকার মতই এই শহীদ মিনার তৈরি হয়েছে। সকলের হাতে ফুল, ফুলের তোড়া, ফুলের ডালা, ফুলের মালা। সবাই অপেক্ষা করছে কখন বারটা বাজবে। অধির আগ্রহে। ঠিক বারটা এক মিনিটে ছোট্ট একটি তিন বছরের শিশু প্রথম ফুলের মালা দিল বেদীতলে। তারপর স্বনির্বাসিত প্রবাসি কবি শহীদ কাদরী। তিনি এসেছেন বোষ্টন থেকে। নিশিথের স্তব্ধতাকে ভেঙে সকলে গেয়ে উঠল, 'আমার ভায়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারী, আমি কি ভুলিতে পারি ...। একে একে সবাই এগিয়ে গেল পুস্পার্ঘ নিয়ে। অনেক সংগঠনের কর্মকর্তা, পুরুষ মহিলা, শিশু কিশোর আর অন্যান্য রাজ্য থেকে আসা প্রবাসীরা। চলতে থাকল একুশের গান। যে গানের সুর মুহূর্তে চলে যায় সহস্র মাইল দূরে, ঢাকার মেডিকেলের সামনে। জীবন্ত দৃশ্য ভেসে উঠে মানসচক্ষে। অথচ তাকিয়ে আছে এখানে, এই জাতিসঙ্ঘের সামনে অস্থায়ীভাবে নির্মিত শহীদ মিনারের দিকে।

ফেরার পথে আনিস বলল, বাহার ভাই, সবই তো আছে এখানে। বাংলাদেশে যাবার ইচ্ছেটা এখনও কেন ঢিলে হচ্ছে না?

নাড়ীর টান! তোমার আমার ঢিলে হবেনা কোন দিন। নতুন প্রজন্ম, যারা এখানে বড় হচ্ছে, তাদের কোন টানই থাকবে না। কারন সে দেশটা কি তা তারা বুঝবেই না। তাদের কাছে ওটা বাবা মায়ের দেশ, তাদের নয়।

ক্রমশঃ...